আল হাশর

৫৯

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'আল হাশর' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য এরূপ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ এরূপ বলো যে, এটা সূরা নাযীর। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার ঐকমত্যভিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নাযীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল ? এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরী একে হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মা'উনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মা'উনা'র মর্মান্তিক ঘটনা ওহুদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিল—আগে নয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে হলে মদীনা ও হিজাযের ইহুদীদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তা নাহলে নবী (সা) তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে আচরণ করেছিলেন তার প্রকৃত কারণসমূহ কি ছিল কেউ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে না।

আরবের ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তারা নিজেরাও পুস্তক বা শিলালিপি আকারে এমন কোন লিখিত বিষয় রেখে যায়নি যা তাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করতে পারে। তাছাড়া আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক কিংবা লেখকগণও তাদের কোন উল্লেখ করেননি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, আরব উপদ্বীপে এসে তারা তাদের স্বজাতির অন্য সব জাতি–গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দুনিয়ার ইহুদীরা তাদেরকে স্বজাতীয় লোক বলে মনেই করতো না। কারণ তারা ইহুদী সভ্যতা–সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। হিজাযের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনাদির মধ্যে যেসব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ইহুদীদের কোন নাম নিশানা বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে শুধুমাত্র কয়েকজন ইহুদীর নাম পাওয়া যায়। এ কারণে আরব ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ আরবদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার ওপরে নির্ভরশীল। এরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত।

হিজাযের ইহুদীরা দাবী করতো যে, তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনকালের শেষদিকে সর্বপ্রথম এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এই কাহিনী বর্ণনা করে তারা বলতো, হযরত মূসা (আ) আমালেকাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি সেনাদলকে ইয়াসরিব অঞ্চল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ জাতির কোন ব্যক্তিকেই যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলদের এই সেনাদল নবীর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করল। তবে, আমালেকাদের বাদশার একটি সুদর্শন যুবক ছেলে ছিল। তারা তাকে হত্যা করল না। বরং সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এর পূর্বেই হযরত মূসা (আ) ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন ঃ একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ এবং মূসার শরীয়াতের বিধি–বিধানের স্পষ্ট লংঘন। তাই তারা উক্ত সেনাদলকে তাঁদের জামায়াত থেকে বহিষ্কার করে। বাধ্য হয়ে দলটিকে ইয়াসরিবে ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে হয়। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৯৪) এভাবে ইহুদীরা যেন দাবী করছিল যে, খৃষ্টপূর্ব ১২শ' বছর পূর্বে থেকেই তারা এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত এ কাহিনী তারা এ জন্য গড়ে নিয়েছিল যাতে আরবের অধিবাসীদের কাছে তারা নিজেদের সুপ্রাচীন ও অভিজাত হওয়া প্রমাণ করতে পারে।

ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনা অনুসারে খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সনে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে আরেকবার এদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। এই সময় বাবেলের বাদশাহ 'বখতে নাস্‌সার' বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, সেই সময় আমাদের কিছু সংখ্যক গোত্র এসে ওয়াদিউল কুরা, তায়মা এবং ইয়াস্‌রিবে বসতি স্থাপন করেছিল। (ফুতূহুল বুলদান, আল বালাযুরী) কিন্তু এর পেছনেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অসম্ভব নয় যে, এর মাধ্যমেও তারা তাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রমাণিত তা হলো, ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ওপর গণহত্যা চালায় এবং ১৩২ খৃষ্টাব্দে এই ভূখণ্ড থেকে তাদের

সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করে সেই সময় বহু সংখ্যক ইহুদী গোত্র পালিয়ে হিজাযে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কেননা, এই এলাকা ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল সংলগ্ন। এখানে এসে তারা যেখানেই ঝর্ণা ও শ্যামল উর্বর স্থান পেয়েছে সেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র ও সুদী কারবারের মাধ্যমে সেসব এলাকা কুক্ষিগত করে ফেলেছে। আয়লা, সাকনা, তাবুক, তায়মা, ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক এবং খায়বরের ওপরে এই সময়েই তাদের আধিপত্য কায়েম হয়েছিলো। বনী কুরাইযা, বনী নাযীর, বনী বাহদাল এবং বনী কায়নুকাও এ সময়ই আসে এবং ইয়াসরিবের ওপর আধিপত্য কায়েম করে।

ইয়াসরিবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা ইহুদী পুরোহিত (Cohens বা Priests) শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে তাদের অভিজাত বলে মান্য করা হতো এবং স্বজাতির মধ্যে তারা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। এরা যে সময় মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে তখন কিছু সংখ্যক আরব গোত্রও এখানে বসবাস করতো। ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কার্যত শস্য-শ্যামল উর্বর এই ভূখণ্ডের মালিক মোখতার হয়ে বসে। এর প্রায় তিন শ' বছর পরে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়ামানে সেই মহাপ্লাবন আসে সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে যার আলোচনা করা হয়েছে। এই প্লাবনের কারণে সাবা কওমের বিভিন্ন গোত্র ইয়ামান ছেড়ে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এদের মধ্য থেকে গাস্‌সানীরা সিরিয়ায়, লাখামীরা হীরায় (ইরাক), বনী খুযা'আ জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এবং আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইহুদীরা যেহেতু আগে থেকেই ইয়াসরিবের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তাই প্রথম প্রথম তারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে কর্তৃত্ব চালানোর কোন সুযোগ দেয়নি। তাই এ দু'টি আরব গোত্র অনুর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয় যেখানে জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণও তারা খুব কষ্টে সংগ্রহ করতে পারতো। অবশেষে তাদের একজন নেতা তাদের স্বগোত্রীয় গাসসানী ভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সিরিয়া গমন করে এবং সেখান থেকে একটি সেনাদল এনে ইহুদীদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়। এভাবে আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করে এবং ইহুদীদের দু'টি বড় গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা শহরের বাইরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় আরেকটি ইহুদী গোত্র বনী কায়নুকার যেহেতু বনু কুরাইযা ও বনু নাজীর গোত্রের সাথে তিক্ত সম্পর্ক ছিল তাই তারা শহরের ভেতরেই থেকে যায়। তবে এখানে থাকার জন্য তাদেরকে খাযরাজ গোত্রের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হয়। এর বিরুদ্ধে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রকে আওস গোত্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় নিতে হয় যাতে তারা নিরাপদে ইয়াসরিবের আশেপাশে বসবাস করতে পারে। নীচের মানচিত্র দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে, এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াসরিব এবং তার আশেপাশে কোথায় কোথায় ইহুদী বসতি ছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে হিজরাতের সূচনাকাল পর্যন্ত সাধারণভাবে গোটা হিজাযের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবে ইহুদীদের অবস্থা ও পরিচয় মোটামুটি এরূপ ছিল ঃ

হিজরতের পর মদীনায় ইয়াহুদী অবস্থানসমূহ
বুহাইরা
মাজমাউল আসইয়াল
উত্তর
ওহোদ পর্বতমালা
রুমা কূপ
আল-কানাত উপত্যকা
বাগ বাগিচা
বনু হারেসা গোত্রের বসবাস স্থান
সালয়া পর্বত
আবদুল আলহাল গোত্রের বসবাস স্থান
ইয়াসরিব নগর
মসজিদে নববী
আল বকী
ইয়াসরিব নগর
বনু জফর গোত্রের আবাস
মাহজুর উপত্যকা
আল-আওয়ালী বাগানসমূহ
কুবা
যুলহুলাইফা
বনু নজীর গোত্রের আবাস
আইর পাহাড়
কায়াব ইবনে আশরাফের দুর্গ

ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাহযীব, তামাদ্দুন সবদিক দিয়ে তারা আরবী ভাবধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের অধিকাংশের নামও হয়ে গিয়েছিল আরবী। হিজাযে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্র ছিল বারটি। তাদের মধ্যে একমাত্র বনী যা'যুরা ছাড়া আর কোন গোত্রেরই হিব্রু নাম ছিল না। হাতেগোণা কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া তাদের কেউ-ই হিব্রু ভাষা জানত না। জাহেলী যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্যগাঁথা আমরা দেখতে পাই তার ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুতে আরব কবিদের থেকে স্বতন্ত্র এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা তাদেরকে আলাদাভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে। তাদের ও আরবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের ও সাধারণ আরবদের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে একেবারে বিলীনও হয়ে যায়নি। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের ইহুদী জাত্যাভিমান ও পরিচয় টিকিয়ে রেখেছিল। তারা বাহ্যত আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল শুধু এ জন্য যে, তাছাড়া তাদের পক্ষে আরবে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। আরবী ভাবধারা গ্রহণ করার কারণে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে নিয়েছে যে, তারা মূলত বনী ইসরাঈল নয়, বরং ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব কিংবা তাদের অধিকাংশ অন্তত আরব ইহুদী। ইহুদীরা হিজাযে কখনো ধর্ম প্রচারের কাজ করেছিল অথবা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খৃস্টান পাদ্রী এবং মিশনারীদের মত আরববাসীদের ইহুদী ধর্মের প্রতি আহবান জানাতো এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে ইসরাঈলিয়াত বা ইহুদীবাদের চরম গোঁড়ামি এবং বংশীয় আভিজাত্যের গর্ব ও অহংকার ছিল। আরবের অধিবাসীদের তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলে আখ্যায়িত করত যার অর্থ শুধু নিরক্ষরই নয়, বরং অসভ্য এবং মূর্খও। তারা বিশ্বাস করত, ইসরাঈলীরা যে মানবাধিকার ভোগ করে এরা সে অধিকার লাভেরও উপযুক্ত নয়। বৈধ ও অবৈধ সব রকম পন্থায় তাদের অর্থ-সম্পদ মেরে খাওয়া ইসরাঈলীদের জন্য হালাল ও পবিত্র। নেতৃ পর্যায়ের লোক ছাড়া সাধারণ আরবদের তারা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে সমান মর্যাদা দেয়ার উপযুক্তই মনে করত না। কোন আরব গোত্র বা বড় কোন আরব পরিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব লোকগাথায় তার কোন হদিসও মেলে না। এমনিতেও ইহুদীদের ধর্মপ্রচারের চেয়ে নিজেদের আর্থিক কায়-কারবারের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল অধিক। তাই একটি ধর্ম হিসেবে হিজাযে ইহুদীবাদের বিস্তার ঘটেনি। বরং তা হয়েছিল কয়েকটি ইহুদী গোত্রের গর্ব ও অহংকারের পুঁজি। তবে ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাবীজ-কবচ, ভাল-মন্দ লক্ষণ নির্ণয় এবং যাদুবিদ্যার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এ কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও 'আমলে'র খ্যাতি ও প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।

আরব গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল অধিক মজবুত। তারা যেহেতু ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য অঞ্চল থেকে এসেছিল তাই এমন অনেক শিল্প ও কারিগরী তারা জানতো যা আরবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া বাইরের জগতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। এসব কারণে ইয়াসরিব এবং হিজাযের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানী আর এখান থেকে খেজুর রপ্তানীর কারবার তাদের হাতে চলে এসেছিল। হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য শিকারেরও বেশীর ভাগ তাদেরই করায়ত্ত ছিল। বস্ত্র উৎপাদনের কাজও তারাই করত। তারাই আবার জায়গায়

জায়গায় পানশালা নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব জায়গা থেকে মদ এনে বিক্রি করা হতো। বনু কায়নুকা গোত্রের অধিকাংশ লোক স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র নির্মাণ পেশায় নিয়োজিত ছিল। এসব কায়কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক মুনাফা লুটতো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় কারবার ছিল সুদী কারবার। আশেপাশের সমস্ত আরবদের তারা এই সুদী কারবারের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের নেতা ও সরদাররা বেশী করে এই জালে জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ঋণগ্রহণ করে জাঁকজমকে চলা এবং গর্বিত ভঙ্গিতে জীবনযাপন করার রোগ সবসময়ই তাদের ছিল। এরা অত্যন্ত চড়া হারের সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতো এবং তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়াতে থাকত। কেউ একবার এই জালে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। এভাবে তারা আর্থিক দিক দিয়ে আরবদেরকে অন্তসারশূন্য করে ফেলেছিল। তবে তার স্বাভাবিক ফলাফলও দাঁড়িয়েছিল এই যে, তাদের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল।

—আরবদের মধ্যে কারো বন্ধু হয়ে অন্য কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করা এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আরবদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়া এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূলে। কারণ, তারা জানতো, আরব গোত্রসমূহ যখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে তখন আর তারা সেই সব সহায়-সম্পত্তি, বাগান এবং শস্য-শ্যামল ফসলের মাঠ তাদের অধিকারে থাকতে দেবে না, যা তারা সুদী কারবার ও মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লাভ করেছে। তাছাড়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রতিটি গোত্রকে কোন না কোন শক্তিশালী আরব গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হতো যাতে অন্য কোন শক্তিশালী গোত্র তাদের গায়ে হাত তুলতে না পারে। এ কারণে আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে তাদেরকে বারবার শুধু জড়িয়ে পড়তেই হতো না, বরং অনেক সময় একটি ইহুদী গোত্রকে তার মিত্র আরব গোত্রের সাথে মিলে অপর কোন ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হতো, বিরোধী আরব গোত্রের সাথে যাদের থাকতো মিত্রতার সম্পর্ক। ইয়াসরিবে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর ছিল আওস গোত্রের এবং বনী কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'বু'আস' নামক স্থানে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এই ইহুদী গোত্রগুলোও নিজ নিজ বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলাম পৌঁছে এবং শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহর (সা) আগমনের পর সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সাথে সাথে তিনি প্রথম যে কাজগুলো করলেন তার মধ্যে একটি হলো আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃবন্ধন সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, এই মুসলিম সমাজ এবং ইহুদীদের মধ্যে স্পষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এ চুক্তিতে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, একে অপরের অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করবে না এবং বাইরের শত্রুর মোকাবিলায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ইহুদী এবং মুসলমানরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মেনে চলবে এই চুক্তি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। চুক্তির কতকগুলো বিষয় নিম্নরূপ ঃ

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة - وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الا ثم - وانه لم يثم امر وبحليفه ، وان النصر للمظلوم ، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة .... وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد رسول الله .... وانه لاتجار قريش ولا من نصرها ، وان بينهم والنصر على من دهم يثرب - على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم -

(ابن هشام - ج ٢ - ص ١٤٧ - ١٥٠)

ইয়াহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে এবং মুসলমানরাও নিজেদের ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তির পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে তারা একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক হবে কল্যাণ করা ও অধিকার পৌঁছিয়ে দেয়ার সম্পর্কে গোনাহ ও সীমালংঘনের সম্পর্ক নয়।

কেউ তার মিত্রশক্তির সাথে কোনপ্রকার খারাপ আচরণ করবে না।

মজলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য করা হবে।

যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে তার ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে কোনপ্রকার ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এই চুক্তির শরীক পক্ষগুলোর মধ্যে যদি এমন কোন ঝগড়া–বিবাদ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় যার কারণে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে তাহলে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বিধান অনুসারে তার মীমাংসা করবেন। ....

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র ও সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া হবে না।

কেউ ইয়াসরিবের ওপর আক্রমণ করলে চুক্তির শরীকগণ তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। প্রত্যেকপক্ষ নিজ নিজ এলাকার প্রতিরক্ষার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত)

এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় চূড়ান্ত চুক্তি। ইহুদীরা নিজেরাই এর শর্তাবলী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করল। তাদের এই শত্রুতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। এর বড় বড় কারণ ছিল তিনটি ঃ

এক ঃ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাতির একজন নেতা হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিল যিনি তাদের সাথে শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবেন এবং নিজের দলের পার্থিব স্বার্থের সাথে কেবল তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু তারা দেখলো, তিনি আল্লাহ, আখেরাত, রিসালাত এবং কিতাবের প্রতিও ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন (যার মধ্যে তাদের নিজেদের রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও অন্তরভুক্ত) এবং গোনাহর কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে আহবান জানাচ্ছেন, খোদ তাদের নবী-রসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে যে আহবান জানাতেন। এসব ছিল তাদের কাছে অপছন্দনীয়। তারা আশংকাবোধ করলো, যদি এই বিশ্বজনীন আদর্শিক আন্দোলন চলতেই থাকে তাহলে তার সয়লাবের মুখে তাদের স্থুল ও অচল ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এবং বংশ ও গোষ্ঠীগত জাতীয়তা খড়কুটোর মত ভেসে যাবে।

দুই ঃ আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে এবং আশেপাশের আরব গোত্রসমূহের যারাই ইসলামের এই আহবানে সাড়া দিচ্ছে তারাই মদীনার এই ইসলামী ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে তারা এই ভেবে শংকিত হয়ে উঠলো যে, নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের খাতিরে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থোদ্ধার করার যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে নতুন এই ব্যবস্থাধীনে তা আর চলবে না, বরং এখন তাদেরকে আরবের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। যেখানে এই অপকৌশল আর সফল হবে না।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজ ও সভ্যতার যে সংস্কার করছিলেন তাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকম অবৈধ পথ ও পন্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাও অন্তরভুক্ত ছিল। সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাপার হলো, সুদভিত্তিক কারবারকেও তিনি নাপাক উপার্জন এবং হারাম খাওয়া' বলে ঘোষণা করছিলেন। এ কারণে তারা আশংকা করছিল যে, আরব জনগণের ওপর যদি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব কায়েম হয় তাহলে তিনি আইনগতভাবে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন। একে তারা নিজেদের মৃত্যুর শামিল বলে মনে করছিল।

এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ হিসেবে স্থির করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অপকৌশল, ষড়যন্ত্র ও উপায় অবলম্বন করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হতো না। সাধারণ

মানুষ যাতে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে সে জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারণা চালাতো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে সব রকমের সন্দেহ–সংশয় ও দ্বিধা–দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতো। যাতে তারা এ দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যত বেশী পারা যায় ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য নিজেরাও মিথ্যামিথ্যি ইসলাম গ্রহণ করতো এবং তারপর আবার মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী হয়ে যতো। অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য মুনাফিকদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতো। ইসলামের শত্রু প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো। তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন। দীর্ঘদিন যাবত এ দু'টি গোত্রের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বারবার 'বু'আস' যুদ্ধের আলোচনা তুলে তাদেরকে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। যাতে আরেকবার তাদের মধ্যে তরবারির ঝনঝনানি শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম তাদেরকে যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলো তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করার জন্যও তারা নানারূপ জালিয়াতি করতো। যাদের সাথে আগে থেকেই তাদের লেনদেন ছিল তাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো তারা তার ক্ষতিসাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতো। তার কাছে যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তাকে উত্যক্ত ও বিব্রত করে তুলতো। তবে তার যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তা আত্মসাৎ করতো। তারা প্রকাশ্যে বলতো ঃ আমরা তোমার সাথে যখন লেনদেন ও কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্যকিছু। এখন যেহেতু তুমি তোমার ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলেছো তাই আমাদের কাছে তোমার কোন অধিকারই আর অবশিষ্ট নেই। তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে নায়শাবুরী. তাফসীরে তাবরাসী এবং তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে সূরা আলে ইমরানের ৭৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

চুক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এই শত্রুতামূলক আচরণ তারা বদর যুদ্ধের আগে থেকেই করতে শুধু করেছিলো। কিন্তু বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কুরাইশদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলে তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা আশা করেছিলো, এই যুদ্ধে কুরাইশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের এই বিজয়ের খবর পৌঁছার পূর্বেই তারা মদীনায় গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গিয়েছেন, মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটেছে এবং আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু ফলাফল তাদের আশা আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত হলে তারা রাগে ও দুঃখে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। বনী নাযীর গোত্রের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ চিৎকার করে বলতে শুরু করলোঃ খোদার শপথ, মুহাম্মাদ যদি আরবের এসব সম্মানিত নেতাদের হত্যা করে থাকে তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগই আমাদের জন্য অধিক উত্তম। এরপর সে মক্কায় গিয়ে হাজির হলো এবং বদর যুদ্ধে যেসব কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিলো তাদের নামে অত্যন্ত উত্তেজনাকর শোকগাঁথা শুনিয়ে শুনিয়ে মক্কাবাসীদের

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করতে থাকলো। এরপর সে মদীনায় ফিরে আসলো এবং নিজের মনের ঝাল মিটানোর জন্য এমন সব কবিতা ও গান গেয়ে শুনাতে শুরু করলো যাতে সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী–কন্যাদের সাথে প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেম সম্পর্কের কথা উল্লেখ থাকতো। তার এই ঔদ্ধত্য ও বখাটেপনায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত নবী (সা) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারীকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করাতে বাধ্য হলেন। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের যে গোত্রটি সমষ্টিগতভাবে সর্বপ্রথম খোলাখুলি চুক্তিভংগ করেছিল সেটি ছিল বনু কায়নুকা গোত্র। এরা মদীনার শহরাভ্যন্তরে একটি মহল্লায় বাস করতো। যেহেতু তারা স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিল, তাই মদীনাবাসীদের তাদের বাজারে বেশী বেশী যাতায়াত করতে হতো। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। কর্মকার হওয়ার কারণে তাদের প্রতিটি বাচ্চা পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সাত শত যুদ্ধোপযোগী পুরুষ। খাযরাজ গোত্রের সাথে তাদের পুরনো মিত্রতা সম্পর্ক ছিল। আর খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে 'উবাই ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক। এ কারণেও তাদের অহমিকা ছিল। বদর যুদ্ধের ঘটনায় তারা এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের বাজারে যাতায়াতকারী মুসলমানদের বিব্রত করা ও কষ্ট দেয়া এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের উত্যক্ত করতে শুরু করেছিলো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, তাদের বাজারে একদিন একজন মুসলমান মহিলাকে সবার সামনে উলঙ্গ করে ফেলা হলে তা নিয়ে মারাত্মক ঝগড়া–বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং হাংগামায় একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদী নিহত হয়। পরিস্থিতি এতদূর গড়ালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মহল্লায় গেলেন এবং তাদের সবাইকে ডেকে একত্রিত করে ন্যায় ও সততার পথ অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা বললো ঃ "মুহাম্মাদ, সম্ভবত তুমি আমাদেরকেও কুরাইশ মনে করেছো? যুদ্ধবিদ্যায় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। তাই তুমি তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছো। কিন্তু আমাদের সাথে পালা পড়লে জানতে পারবে পুরুষলোক কাকে বলে।" এটা ছিল স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অবশেষে নবী (সা) দুই হিজরীর শাওয়াল (অপর এক বর্ণনা অনুসারে যিলকা'দা) মাসের শেষ দিকে তাদের মহল্লা অবরোধ করলেন। মাত্র পনের দিন অবরোধ চলার পরই তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং তাদের যুদ্ধক্ষম সমস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করা হলো। এই সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সাহায্য সমর্থনে এগিয়ে আসলো। নবী (সা) যেন তাদের ক্ষমা করে দেন এ জন্য সে বারবার অনুরোধ উপরোধ করতে থাকলো। নবী (সা) তার আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বনু কায়নুকা তাদের অর্থ–সম্পদ, অস্ত্র–শস্ত্র এবং শিল্প–সরঞ্জাম রেখে মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

এ দু'টি চরম পদক্ষেপ (অর্থাৎ বনী কায়নুকার বহিষ্কার এবং কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা) গ্রহণ করার ফলে কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদীরা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত রইলো যে, আর কোন দুষ্কর্ম করার সাহস তাদের হলো না। কিন্তু হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসলে ইহুদীরা দেখলো, কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র এক হাজার

লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকেও তিন শত মুনাফিক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছে। তখন তারা প্রথমবারের মত স্পষ্টভাবে চুক্তিলংঘন করে বসলো। অর্থাৎ মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবীর (সা) সাথে শরীক হলো না। অথচ চুক্তি অনুসারে তারা তা করতে বাধ্য ছিল। এরপর উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। এমন কি রসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার জন্য বনী নাযীর গোত্র একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে বসলো। কিন্তু ঠিক বাস্তবায়নের মুখে তা বানচাল হয়ে গেল। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, বিরে মা'যুনা'র মর্মান্তিক ঘটনার (৪র্থ হিজরীর সফর মাস) পর আমর ইবনে উমাইয়া দামরী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুলক্রমে বনী আমের গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোক। 'আমর তাদেরকে শত্রু গোত্রের লোক মনে করেছিল। এ ভুলের কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের রক্তপণ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর বনী আমের গোত্রের সাথে চুক্তিতে যেহেতু বনী নাযীর গোত্রও শরীক ছিল, তাই রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদেরকে শরীক হওয়ার আহবান জানাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজে তাদের এলাকায় গেলেন। সেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু খোশগল্পে ব্যস্ত রেখে ষড়যন্ত্র আঁটলো যে, তিনি যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর ওপর একখানা ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার আগেই আল্লাহ তা'আলা যথা সময়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এরপর তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে তাদেরকে চরমপত্র দিলেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে তা আমি জানতে পেরেছি। অতএব দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমাদের জনপদে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে খবর পাঠালো যে, আমি দুই হাজার লোক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাই তোমরা রুখে দাঁড়াও, নিজেদের জায়গা পরিত্যাগ করো না। এ মিথ্যা আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমপত্রের জবাবে তারা জানিয়ে দিল যে, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন। এতে ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। অবরোধের মাত্র ক'দিন পরই (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র ছয় দিন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে পনর দিন) তারা এই শর্তে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলো যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিস নিজেদের উটের পিঠে চাপিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাবে। এভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় এই পাপী গোত্র থেকে মদীনাকে মুক্ত করা হলো। তাদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল এবং অন্যরা সবাই সিরিয়া ও খায়বার এলাকার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সম্পর্কেই এ সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এতে মোটামুটি চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম চারটি আয়াতে গোটা দুনিয়াবাসীকে সেই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বনী নাযীর গোত্র সবেমাত্র যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। একটি বৃহত গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। অর্থ–সম্পদে যারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, যাদের কাছে যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না এবং যাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত, মাত্র কয়েকদিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং কোন একজন মানুষ নিহত হওয়ার মত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না। তারা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা তাদের আপন জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি। বরং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল। আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়।

(২) ৫নং আয়াতে যুদ্ধের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। নীতিটি হলো, শত্রুদের এলাকার অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে যে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করতে হয় তা ফাসাদ ফিল আরদ অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির সমার্থক নয়।

(৩) যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে যেসব ভূমি ও সম্পদ ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে ৬ থেকে ১০নং আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ সময়ই প্রথমবারের মত একটি বিজিত অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসেছিলো, সে জন্য এখানে তার আইন–বিধান বলে দেয়া হয়েছে।

(৪) বনী নাযীর যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে আচরণ ও নীতিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল ১১ থেকে ১৭ আয়াতে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের এই আচরণ ও নীতিভঙ্গির মূলে যেসব কারণ কার্যকর ছিল তাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

(৫) শেষ রুকূ'র পুরোটাই উপদেশবাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই তাদের লক্ষ করেই এই উপদেশবাণী। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমানের মূল দাবী কি, তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি, যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার স্বীকৃতি তারা দিচ্ছে সেই আল্লাহ কি কি গুণাবলীর অধিকারী?

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ②

আল্লাহরই তাসবীহ করেছে আসমান ও যমীনের প্রতিটি জিনিস। তিনিই বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।[১]

তিনিই আহলেকিতাব কাফেরদেরকে প্রথম আক্রমণেই[২] *তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন।*[৩] *তোমরা কখনো ধারণাও কর নাই যে, তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করে বসেছিলো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।*[৪] *কিন্তু আল্লাহ এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন, যে দিকের ধারণাও তারা করতে পারেনি।*[৫] *তিনি তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, তারা নিজ হাতেও নিজেদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করছিলো এবং মু'মিনদের হাত দিয়েও ধ্বংস করছিলো।*[৬] *অতএব, হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা,*[৭] *শিক্ষাগ্রহণ করো।*

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা হাদীদের তাফসীরের ১ ও ২নং টীকা। বনী নাযীরের বহিষ্কার সম্পর্কে বিশ্লেষণ শুরু করার আগে এই প্রারম্ভিক কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো মন-মগজকে এ সত্য উপলব্ধি করতে প্রস্তুত করা যে, এই শক্তিশালী

ইহুদী গোত্রের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা মুসলমানদের শক্তির কারণে নয়, বরং আল্লাহর অসীম শক্তির বিস্ময়কর কীর্তি মাত্র।

২. মূল শব্দ হলো لِأَوَّلِ الْحَشْرِ। হাশর (حَشْر) শব্দের অর্থ বিক্ষিপ্ত জনতাকে একত্র করা অথবা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিদের একত্রিত করে বের হওয়া। আর لِأَوَّلِ الْحَشْرِ –এর অর্থ হলো, প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সাথে অথবা প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সময়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এখানে প্রথম হাশর বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদলের মতে এর অর্থ মদীনা থেকে বনী নাযীরের বহিষ্কার। একে প্রথম হাশর এই অর্থে বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বিতীয় হাশর হয়েছিলো হযরত 'উমরের (রা) সময়ে। এই সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর তাদের শেষ হাশর হবে কিয়ামতের দিন। দ্বিতীয় দলের মতে এর অর্থ হলো মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশের ঘটনা যা বনী নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য করা হয়েছিল সুতরাং لِأَوَّلِ الْحَشْرِ –এর অর্থ হলো, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছিলো। লড়াই ও রক্তপাতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরাতে তারা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। অন্য কথায় এখানে এ বাক্যাংশটি আক্রমণের "প্রথম চোটে" বা "প্রথম আঘাতে" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন ঃ در اول جمع کردن لشکر। শাহ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলো ঃ پہلے ہی بہیر ہوتے আমাদের মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই এ আয়াতাংশের সঠিক ও বোধগম্য অর্থ।

৩. এখানে প্রথমেই একটি বিষয় বুঝে নেয়া উচিত, যাতে বনী নাযীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে কোন মানসিক দ্বিধা–দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী নাযীর গোত্রের যথারীতি একটি লিখিত চুক্তি ছিল। এ চুক্তিকে তারা বাতিলও করেছিলো না যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই মনে করা চলে। তবে যে কারণে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা হলো, এই চুক্তি লংঘনের অনেকগুলো ছোট বড় কাজ করার পর তারা এমন একটি কাজ করে বসেছিল যা সুস্পষ্টভাবে চুক্তিভংগেরই নামান্তর। অর্থাৎ তারা চুক্তির অপর পক্ষ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর তাও এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, সে জন্য তাদেরকে চুক্তিভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশদিন সময় দিয়ে এই মর্মে চরমপত্র দিলেন যে, এই সময়ের মধ্যেই তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এই চরমপত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "যদি তোমরা কোন কওমের পক্ষ থেকে বিশ্বাসভংগের (চুক্তিলংঘনের) আশংকা কর তাহলে সেই চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।" (সূরা আল আনফাল—৫৮) এ কারণে তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাজ বলে ঘোষণা করছেন। কারণ, তা ছিল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। যেন তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ বহিষ্কার করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলা নিজে বহিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

৪. একথাটি বুঝার জন্য মনে রাখা দরকার যে, বনী নাযীর শত শত বছর ধরে এখানে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে বসবাস করে আসছিল। মদীনার বাইরে তাদের গোটা জনবসতি একই সাথে ছিল। নিজের গোত্রের লোকজন ছাড়া আর কোন গোত্রের লোকজন তাদের মধ্যে ছিল না। গোটা বসতি এলাকাকে তারা একটি দুর্গে রূপান্তরিত করেছিল। সাধারণত বিশৃংখলাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন উপজাতীয় এ এলাকায় ঘর–বাড়ী যেভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তাদের ঘর–বাড়ীও ঠিক তেমনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল ছোট ছোট দুর্গের মত। তাছাড়া তাদের সংখ্যাও সেই সময়ের মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। এমনকি মদীনার অভ্যন্তরেও বহু সংখ্যক মুনাফিক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাই মুসলমানরাও কখনো এ আশা করেনি যে, লড়াই ছাড়া শুধু অবরোধের কারণেই দিশেহারা হয়ে তারা নিজেদের বসতভিটা ছেড়ে চলে যাবে। বনু নাযীর গোত্রের লোকজন নিজেরাও একথা কল্পনা করেনি যে, কোন শক্তি মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই তাদের হাত থেকে এ জায়গা ছিনিয়ে নেবে। তাদের পূর্বে যদিও বনী কায়নুকা গোত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো এবং নিজেদের বীরত্বের অহংকার তাদের কোন কাজেই আসেনি। কিন্তু তারা ছিল মদীনার অভ্যন্তরে এক মহল্লার অধিবাসী। তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র কোন দুর্গ–প্রাকার বেষ্টিত জনপদ ছিল না। তাই বনী নাযীর গোত্র মনে করতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের টিকে থাকতে না পারা অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু ছিল না। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের সুরক্ষিত জনপদ এবং মজবুত দুর্গসমূহ দেখে ধারণাও করতে পারতো না যে, এখান থেকে কেউ তাদের বহিষ্কার করতে পারে। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার চরমপত্র দিলে তারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে খোলাখুলি জবাব দিল, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে একথা বললেন যে, তারা মনে করে নিয়েছিলো তাদের ছোট ছোট দুর্গের মত বাড়ীঘর তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে? বনী নাযীর কি সত্যি সত্যিই জানতো যে, তাদের মোকাবিলা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নয়, বরং খোদ আল্লাহর সাথে? আর এটা জানার পরেও কি তারা একথা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের দুর্গসমূহ আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে? যারা ইহুদী জাতির মানসিকতা এবং তাদের শত শত বছরের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত নয় এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এ প্রশ্ন দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি করবে। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে মোকাবিলা হচ্ছে সচেতনভাবে একথা জেনে শুনেও তারা এ ধরনের খোশ খেয়ালে মত্ত থাকবে এবং ভাববে যে, তাদের দুর্গ এবং অস্ত্রশস্ত্র তাদেরকে আল্লাহর থেকে রক্ষা করবে। এ কারণে একজন অনভিজ্ঞ লোক এখানে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ করবেন এই যে, বনী নাযীর বাহ্যত নিজেদের সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দেখে ভুল ধারণা করে বসেছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তাদের মোকাবিলা ছিল আল্লাহর সাথে। এ আক্রমণ থেকে তাদের দুর্গসমূহ তাদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই পৃথিবীতে ইহুদীরা একটি অদ্ভুত জাতি যারা জেনে বুঝেও আল্লাহর মোকাবিলা করে আসছে। তারা আল্লাহর রসূলদেরকে আল্লাহর রসূল জেনেও হত্যা করেছে এবং

অহংকারে বুক ঠুকে বলেছে, আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি। এ জাতির লোকগাঁথায় রয়েছে যে, "তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়া'কূবের (আ) সাথে আল্লাহ তা'আলার সারা রাত ধরে কুস্তি হয়েছে এবং ভোর পর্যন্ত লড়াই করেও আল্লাহ তা'আলা তাকে পরাস্ত করতে পারেননি। অতপর ভোর হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ এখন আমাকে যেতে দাও। এতে ইয়া'কূব (আ) বললেন ঃ যতক্ষণ না তুমি আমাকে বরকত দেবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যেতে দেব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া'কূব। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ ভবিষ্যতে তোমার নাম ইয়া'কূব হবে না, বরং 'ইসরাঈল' হবে। কেননা, তুমি খোদা ও মানুষের সাথে শক্তি পরীক্ষা করে বিজয়ী হয়েছো।" দেখুন ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থের (The Holy Scriptures) আধুনিকতম অনুবাদ, প্রকাশক, জুয়িশ পাবলিকেশন সোসাইটি অব আমেরিকা, ১৯৫৪, আদিপুস্তক, অধ্যায় ৩২, শ্লোক ২৫ থেকে ২৯। খৃষ্টানদের অনূদিত বাইবেলেও এ বিষয়টি একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদীদের অনুবাদের ফুটনোটে 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ঃ He who Striveth with God অর্থাৎ যিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিকাল লিটারেচারে খৃষ্টান পুরোহিতগণ ইসরাঈল শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ Wreslter with God "খোদার সাথে কুস্তি লড়নেওয়ালা।" হোশেয় পুস্তকে হযরত ইয়াকূবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর যৌবনে খোদার সাথে কুস্তি লড়েছেন। তিনি ফেরেশতার সাথে কুস্তি করে বিজয়ী হয়েছেন।" (অধ্যায় ১২, শ্লোক ৪) অতএব একথা স্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলরা মহান সেই ইসরাঈলেরই বংশধর যার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাই খোদার সাথে মোকাবিলা একথা জেনে বুঝেও খোদার বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হওয়া তাদের জন্য এমন কি আর কঠিন কাজ? এ কারণে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে তারা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে এবং একই কারণে তাদের নিজেদের ধারণা অনুসারে তারা হযরত ঈসাকে শূলে চড়িয়েছে এবং বুক ঠুকে বলেছে ঃ انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله (আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ 'ঈসা ইবনে মারয়ামকে হত্যা করেছি)। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল একথা জেনে বুঝেও তারা যদি তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে তাহলে তা তাদের ঐতিহ্য বিরোধী কোন কাজ নয়। তাদের জনসাধারণ না জানলেও পণ্ডিত-পুরোহিত ও আলেম সমাজ ভাল করেই জানতো যে, তিনি আল্লাহর রসূল। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ কুরআন মজীদেই বর্তমান। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ৭৯—৯৫ ; সাফ্‌ফাত, টীকা ৭০—৭৩।

৫. আল্লাহ তা'আলার তাদের ওপর চড়াও হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি অন্য কোন স্থানে ছিলেন সেখান থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন। বরং এটি একটি রূপক বাক্য। এরূপ ধারণা দেয়াই মূলত উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় তাদের ধারণা ছিল, শুধু একটি পন্থায় আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ আনতে পারেন। তাহলো সামনাসামনি কোন সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা। আর তারা মনে করতো যে, দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে তারা সে বিপদ ঠেকাতে পারবে। কিন্তু এমন একটি পথে তিনি তাদের ওপর হামলা করেছেন, যে দিক থেকে কোন বিপদ আসার আদৌ কোন আশংকা তারা করতো

না। সে পথটি ছিল এই যে, ভিতর থেকেই তিনি তাদের মনোবল ও মোকাবিলার ক্ষমতা নিঃশেষ ও অন্তসারশূন্য করে দিলেন। এরপর তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

৬. অর্থাৎ ধ্বংসসাধিত হয়েছে দু'ভাবে। যে দুর্গের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছিল মুসলমানরা বাইরে থেকে অবরোধ করে তা ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করলো। আর ভেতর থেকে তারা নিজেরা প্রথমত মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য স্থানে স্থানে কাঠ ও পাথরের প্রতিবন্ধক বসালো এবং সে জন্য নিজেদের ঘর দরজা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবর্জনা জমা করলো। এরপর যখন তারা নিশ্চিত বুঝতে পারলো যে, এ জায়গা ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতেই হবে তখন তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করতে শুরু করলো যাতে তা মুসলমানদের কোন কাজে না আসে। অথচ এক সময় বড় শখ করে তারা এসব বাড়ীঘর নির্মাণ করে সাজিয়ে গুছিয়েছিল। এরপর তারা যখন এই শর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করলো যে, তাদের প্রাণে বধ করা হবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যাই তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হবে নিয়ে যেতে পারবে তখন যাওয়ার বেলায় তারা ঘরের দরজা, জানালা এবং খুঁটি পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। এমনকি অনেকে ঘরের কড়িকাঠ এবং কাঠের চাল পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে দিল।

৭. এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের কয়েকটি দিক আছে। সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ এই আয়াতাংশে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এই ইহুদীরা মূলত অতীত নবীদেরই উম্মাত ছিল। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, কিতাব বিশ্বাস করতো, পূর্ববর্তী নবীদের বিশ্বাস করতো এবং আখেরাতেও বিশ্বাস করতো। এ সব বিচারে তারা ছিল মূলত সাবেক মুসলমান। কিন্তু তারা যখন দীন ও আখলাককে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির লালসা এবং পার্থিব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ন্যায় ও সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণের নীতি অবলম্বন করলো এবং নিজেদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কোন তোয়াক্কাই করলো না তখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ–দৃষ্টিও আর তাদের প্রতি রইলো না। তা না হলে একথা সবারই জানা যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাই এই পরিণাম দেখিয়ে সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যেন ইহুদীদের মত তারাও নিজেদেরকে খোদার প্রিয়পাত্র ও আদরের সন্তান মনে করে না বসে এবং এই খামখেয়ালীতে মগ্ন না হয় যে, আল্লাহর শেষ নবীর উম্মাত হওয়াটাই তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের গ্যারান্টি। এর বাইরে দীন ও আখলাকের কোন দাবী পূরণ তাদের জন্য জরুরী নয়। সাথে সাথে গোটা দুনিয়ার সেই সব লোককেও এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে এবং নিজেদের সম্পদ ও শক্তি এবং উপায়–উপকরণের ওপর এতটা নির্ভর করে যে, মনে করে তা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। মদীনার ইহুদীদের একথা অজানা ছিল না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কওম বা গোত্রের মান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন না। বরং তিনি একটি আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছেন। এ দাওয়াতের লক্ষ গোটা দুনিয়ার সব মানুষ। এ দাওয়াত গ্রহণ করে যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশের মানুষ কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই তাঁর উম্মাত হিসেবে গণ্য হতে পারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۤءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاۤقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۤئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ۞

আল্লাহ যদি তাদের জন্য দেশান্তর হওয়া নির্দিষ্ট না করতেন তাহলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিতেন।[৮] আর আখেরাতে তো তাদের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছেই। এ হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চরম বিরোধিতা করেছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহর বিরোধিতা করে, তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের ওপর আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা সবই ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে।[৯] (আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন এ জন্য) যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।[১০]

সাল্লামের নিজ খান্দানের লোকজনের মুসলিম সমাজে যে মর্যাদা ছিল হাবশার বেলাল (রা), রোমের সুহাইব (রা) এবং পারস্যের সালমানের (রা)ও সেই একই মর্যাদা ছিল, এটা তারা নিজ চোখে দেখছিল। তাই কুরাইশ, খাযরাজ ও আওস গোত্রের লোকেরা তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে এ আশংকা তাদের সামনে ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছিলেন তা যে অবিকল সেই দাওয়াত যা তাদের নবী–রসূলগণ পেশ করে এসেছেন, এ বিষয়টিও তাদের অজানা ছিল না। এ দাবীও তো তিনি করেননি যে, তিনি নতুন একটি দীন নিয়ে এসেছেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেনি। এখন তোমরা নিজেদের দীন বা জীবন ব্যবস্থা ছেড়ে আমার এই দীন বা আদর্শ গ্রহণ করো। বরং তাঁর দাবী ছিল, এটা সেই একই দীন, সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহর নবী–রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন। প্রকৃতই এটা যে সেই দীন তার সত্যতা তারা তাওরাত থেকে প্রমাণ করতে পারতো। এর মৌল নীতিমালার সাথে নবী–রসূলদের দীনের মৌল নীতিমালার কোন পার্থক্য নেই। এ কারণেই কুরআন মজীদে তাদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ (তোমরা ঈমান আনো আমার নাযিলকৃত সেই শিক্ষার ওপরে যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান শিক্ষার সত্যায়নকারী। সবার আগে তোমরাই তার অস্বীকারকারী হয়ো না) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন চরিত্র ও আখলাকের লোক। তাঁর দাওয়াত কবুল করে মানুষের জীবনে কেমন সর্বাত্মক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তা তারা

চাক্ষুষ দেখছিল। আনসারগণ দীর্ঘদিন থেকে তাদের নিকট প্রতিবেশী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের অবস্থা যা ছিল তাও তারা দেখেছে। আর এখন ইসলাম গ্রহণের পর তাদের যে অবস্থা হয়েছে তাও তাদের সামনে বর্তমান। এভাবে দাওয়াত, দাওয়াতদাতা ও দাওয়াত গ্রহণকারীদের পরিণাম ও ফলাফল সবই তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। এসব দেখে এবং জেনে বুঝেও তারা শুধু নিজেদের বংশগত গোঁড়ামি এবং পার্থিব স্বার্থের খাতিরে এমন একটি জিনিসের বিরোধিতায় সমস্ত শক্তি নিয়ে উঠে পড়ে লাগলো যার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশ অন্তত তাদের জন্য ছিল না। এই সজ্ঞান শত্রুতার পরেও তারা আশা করতো, তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। অথচ গোটা মানব ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, আল্লাহর শক্তি যার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় কোন অস্ত্রই তাকে রক্ষা করতে পারে না।

৮. দুনিয়ার আযাবের অর্থ তাদের নামনিশানা মুছে দেয়া। সন্ধি করে নিজেদের জীবন রক্ষা না করে যদি তারা লড়াই করতো তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। তাদের পুরুষরা নিহত হতো এবং নারী ও শিশুদের দাস–দাসী বানানো হতো। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের উদ্ধার করারও কেউ থাকতো না।

৯. এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মুসলমানরা অবরোধ শুরু করার পর তা সহজসাধ্য করার জন্য বনী নাযীরের বসতির চারদিকে যে খেজুর বাগান ছিল তার অনেক গাছ কেটে ফেলে কিংবা জ্বালিয়ে দেয়। আর যেসব গাছ সামরিক বাহিনীর চলাচলে প্রতিবন্ধক ছিল না সেগুলোকে যথাস্থানে অক্ষত রাখে। এতে মদীনার মুনাফিকরা ও বনী কুরায়যা এমনকি বনী নাযীর গোত্রের লোকও হৈ চৈ করতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ফাসাদ ফিল আরদ্" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন; কিন্তু দেখো, তরুতাজা শ্যামল ফলবান গাছ কাটা হচ্ছে। এটা কি "ফাসাদ ফিল আরদ" নয়? এই সময় আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ নাযিল করলেন ঃ "তোমরা যেসব গাছ কেটেছো এবং যা না কেটে অক্ষত রেখেছো এর কোন একটি কাজও নাজায়েয নয়। বরং এ উভয় কাজেই আল্লাহর সম্মতি রয়েছে।" এ থেকে শরীয়াতের এ বিধানটি পাওয়া যায় যে, সামরিক প্রয়োজনে যেসব ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর তৎপরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা "ফাসাদ ফিল আরদ" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির সংজ্ঞায় পড়ে না। "ফাসাদ ফিল আরদ" হলো কোন সেনাবাহিনীর মাথায় যদি যুদ্ধের ভূত চেপে বসে এবং তারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করে শস্যক্ষেত, গবাদি পশু, বাগান, দালানকোঠা, প্রতিটি জিনিসই নির্বিচারে ধ্বংস ও বরবাদ করতে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে সেটিই সাধারণ বিধান। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, ফসল ধ্বংস করবে না এবং জনবসতি বিরাণ করবে না। কুরআন মজীদে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষদের নিন্দা ও সমালোচনা করতে গিয়ে এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে ঃ "যখন তারা ক্ষমতাসীন হয় তখন শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করে চলে।" (বাকারাহ, ২০৫) হযরত আবু বকরের (রা) এ নীতি ছিল কুরআনের এ শিক্ষারই হুবহু অনুসরণ। তবে সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ নির্দেশ হলো, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন ধ্বংসাত্মক কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়লে তা করা যেতে পারে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে স্পষ্ট করে বলেছেন

যে, قطعو منها ما كان موضعًا للقتال "মুসলমানগণ বনী নাযীরের গাছপালার মধ্যে কেবল সেই সব গাছপালাই কেটেছিলেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল।" (তাফসীরে নায়শাপুরী) ফকীহদের কেউ কেউ ব্যাপারটির এ দিকটার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মত পেশ করেছেন যে, বনী নাযীরের বৃক্ষ কাটার বৈধতা শুধু এ ঘটনার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ থেকে এরূপ সাধারণ বৈধতা পাওয়া যায় না যে, সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলেই শত্রুর গাছপালা কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া যাবে। ইমাম আওযায়ী, লাইস ও আবু সাওর এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে এরূপ করা জায়েয। তবে শুধু ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য এরূপ করা জায়েয নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কুরআন মজীদের এ আয়াত মুসলমানদের হয়তো সন্তুষ্ট করে থাকতে পারে কিন্তু যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করতো না নিজেদের প্রশ্নের এ জবাব শুনে তারা কি সান্ত্বনা লাভ করবে যে, এ দু'টি কাজই আল্লাহর অনুমতির ভিত্তিতে বৈধ? এর জবাব হলো শুধু মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কাফেরদের সন্তুষ্ট করা এর আদৌ কোন উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু ইহুদী ও মুনাফিকদের প্রশ্ন সৃষ্টির কারণে কিংবা মুসলমানদের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল, আমরা "ফাসাদ ফিল আরদে" লিপ্ত হয়ে পড়ি নাই তো? তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, অবরোধের প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক গাছপালা কেটে ফেলা এবং অবরোধের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না এমন সব গাছপালা না কাটা এ দু'টি কাজই আল্লাহর বিধান অনুসারে বৈধ ছিল।

এ সব গাছ কেটে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছিলেন না মুসলমানরা নিজেরাই এ কাজ করে পরে এর শরয়ী বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে বিষয়ে মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমরের বর্ণনা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে জারীর)। ইয়াযীদ ইবনে রূমানের বর্ণনাও তাই। (ইবনে জারীর) অন্যদিকে মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনা হলো, এসব গাছপালা মুসলমানরা নিজেদের সিদ্ধান্তেই কেটেছিলেন। তারপর এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, কাজটি করা তাদের উচিত হয়েছে কিনা? কেউ কেউ তা বৈধ বলে মত প্রকাশ করলেন। আবার কেউ কেউ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে উভয় দলের কাজই সঠিক বলে ঘোষণা করলেন। (ইবনে জারীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ রেওয়ায়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ এ বিষয়ে মুসলমানদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, আমাদের মধ্যে থেকে অনেকে গাছপালা কেটেছে আবার অনেকে কাটেনি। অতএব এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আমাদের কার কাজ পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কার কাজ পাকড়াও হওয়ার যোগ্য? (নাসায়ী) ফকীহদের মধ্যে যারা প্রথম রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদ। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট অহী দ্বারা তা সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। এটা এ বিষয়ের একটা প্রমাণ যে, যেসব ব্যাপারে

وَمَآ أَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑥ مَآ أَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑦

আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন[১১] তা এমন সম্পদ নয়, যার জন্য তোমাদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা করতে হয়েছে। বরং আল্লাহ তা'আলা যার ওপরে চান তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।[১২] এসব জনপদের দখলমুক্ত করে যে জিনিসই আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ, রসূল, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।[১৩] যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে।[১৪] রসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১৫]

আল্লাহর কোন নির্দেশ বর্তমান থাকতো না সে সব ব্যাপারে নবী (সা) ইজতিহাদ করে কাজ করতেন। অপরপক্ষে যেসব ফকীহ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে, মুসলমানদের দু'টি দল ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি মত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দু'টি মতই সমর্থন করেছেন। অতএব জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ যদি সৎনিয়তে ইজতিহাদ করে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে তাদের মতসমূহ পরস্পর ভিন্ন হবে। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে তারা সবাই হকের অনুসারী বলে গণ্য হবেন।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল এসব গাছ কাটার দ্বারাও তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক এবং না কাটা দ্বারাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক। কাটার মধ্যে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনার দিকটি ছিল এই যে, যে বাগান তারা নিজ হাতে তৈরী করেছিল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা যে বাগানের মালিক ছিল সেই সব বাগানের গাছপালা তাদের চোখের

সামনেই কেটে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তারা কোনভাবে কর্তনকারীদের বাধা দিতে পারছে না। একজন সাধারণ কৃষক বা মালিও তার ফসল বা বাগানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। কেউ যদি তার সামনে তার ফসল বা বাগান ধ্বংস করতে থাকে তাহলে সে তার বিরুদ্ধে প্রাণপাত করবে। সে যদি নিজের সম্পদে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারে তবে তা হবে তার চরম অপমান ও দুর্বলতার প্রমাণ। কিন্তু এখানে পুরা একটি গোত্র যারা শত শত বছর ধরে এ স্থানে বসবাস করে আসছিলো অসহায় হয়ে দেখছিলো যে, তাদের প্রতিবেশী তাদের বাগানের ওপর চড়াও হয়ে এর গাছপালা ধ্বংস করছে। কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। এ ঘটনার পর তারা মদীনায় থেকে গেলেও তাদের কোন মান–মর্যাদা অবশিষ্ট থাকতো না। এখন থাকলো গাছপালা না কাটার মধ্যে অপমান ও লাঞ্ছনার বিষয়টি। সেটি হলো, যখন তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো তখন নিজ চোখে দেখছিল যে, শ্যামল–সবুজ যেসব বাগান কাল পর্যন্তও তাদের মালিকানায় ছিল আজ তা মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে। ক্ষমতায় কুলালে তারা ওগুলো পুরাপুরি ধ্বংস করে যেতো এবং অবিকৃত একটি গাছও মুসলমানদের দখলে যেতে দিতো না। কিন্তু তারা নিরূপায়ভাবে সবকিছু যেমন ছিল তেমন রেখে হতাশা ও দুঃখ ভরা মনে বেরিয়ে গেল।

১১. যেসব বিষয় সম্পত্তি বনী নাযীরের মালিকানায় ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা ইসলামী সরকারের হস্তগত হয়েছিলো এখানে সেই সব বিষয় সম্পত্তির কথা বলা হচ্ছে। এসব সম্পদের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যাবে এখান থেকে শুরু করে ১০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সেই সব কথাই বলেছেন। কোন এলাকা বিজিত হয়ে ইসলামী সরকারের দখলভুক্ত হওয়ার ঘটনা যেহেতু এটাই প্রথম এবং পরে আরো এলাকা বিজিত হতে যাচ্ছিলো তাই এ জন্য বিজয়ের শুরুতেই বিজিত ভূমি সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভেবে দেখার মত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ (যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন) বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এই পৃথিবী এবং যেসব জিনিস এখানে পাওয়া যায় তাতে সেই সব লোকদের মূলত কোন অধিকার নেই যারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তারা যদি এর ওপরে দখলকারী ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেও থাকে তাহলেও তার অবস্থা হলো বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য কর্তৃক মনিবের বিষয়–সম্পদ কুক্ষিগত করার মত। প্রকৃতপক্ষে এসব সম্পদের হক হলো তা তার আসল মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মর্জি অনুসারে তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা। আর এভাবে ব্যবহার কেবল নেককার ঈমানদার বান্দারাই করতে পারে। তাই বৈধ ও ন্যায়সংগত যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব সম্পদ কাফেরদের দখলমুক্ত হয়ে ঈমানদারদের করায়ত্ত হবে তার মর্যাদা হলো তার মালিক এ সম্পদ নিজের বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যদের দখল থেকে উদ্ধার করে তাঁর অনুগত ভৃত্যদের দখলে দিয়েছেন। তাই ইসলামী আইনের পরিভাষায় এসব বিষয় সম্পদকে 'ফাই' (প্রত্যাবর্তিত বা ফিরিয়ে আনা সম্পদ) বলা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ এসব সম্পদের অবস্থা ও প্রকৃতি এমন নয় যে, সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে তা অর্জন করেছে। তাই এতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ সম্পদ তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিতে হবে। বরং তার প্রকৃত

অবস্থা হলো, আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাঁর রসূলদের এবং যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব এ রসূল করছেন সেই আদর্শকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। অন্য কথায়, এসব সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হওয়া সরাসরি সেনাবাঁহিনীর শক্তি প্রয়োগের ফল নয়। বরং এটা সেই সামগ্রিক শক্তির ফল যা আল্লাহ তাঁর রসূল, রসূলের উম্মাত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে দান করেছেন। তাই এসব সম্পদ গনীমাতের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন। এতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন কোন অধিকার বর্তায় না যে, তা তাদের মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন করে দিতে হবে।

এভাবে শরীয়াতে 'গনীমাত' ও 'ফাই'–এর আলাদা আলাদা বিধান দেয়া হয়েছে। সূরা আনফালের ৪১নং আয়াতে গনীমাতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিধানটি হলো, গনীমাতের সম্পদ পাঁচটি অংশে ভাগ করা হবে। এর চারটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে এবং একটি অংশ বায়তুলমালে জমা দিয়ে উক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে খরচ করতে হবে। ফাইয়ের বিধান হলো, তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। বরং এর সবটাই পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এই দুই ধরনের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছেঃ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (তোমরা তার বিরুদ্ধে নিজেদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা কর নাই।) কথাটি দ্বারা ঘোড়া বা উট পরিচালনা করার অর্থ সামরিক তৎপরতা চালানো (Warlike Operations)। সুতরাং সরাসরি এ ধরনের তৎপরতার ফলে যেসব সম্পদ হস্তগত হয়ে থাকে তা গনীমাতের সম্পদ। আর যেসব সম্পদ লাভের পেছনে এ ধরনের তৎপরতা নেই তা সবই 'ফাই' হিসেবে গণ্য।

'গনীমাত' ও 'ফাই'–এর মোটামুটি যে অর্থ এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের ফকীহগণ তা আরো স্পষ্ট করে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ গনীমাত হলো সেই সব অস্থাবর সম্পদ যা সামরিক তৎপরতা চালানোর সময় শত্রু সেনাদের নিকট থেকে লাভ করা গিয়েছে। এসব ছাড়া শত্রু এলাকার ভূমি, ঘরবাড়ী এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে না। এ ব্যাখ্যার উৎস হলো হযরত উমরের (রা) সেই পত্র যা তিনি ইরাক বিজয়ের পর হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

فَانْظُرْ مَا اَجْلَبُوْا بِهٖ عَلَيْكَ فِى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ اَوْمَالٍ فَاقْسِمْهُ
بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاتْرُكِ الْاَرْضِيْنَ وَالْاَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا
لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ فِىْ اَعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ –

"সেনাবাহিনীর লোকজন যেসব ধন–সম্পদ তোমাদের কাছে কুড়িয়ে আনবে তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আর ভূমি ও সেচ খালে যেসব লোক কাজ করে ভূমি ও সেচ খাল তাদের জন্য রেখে দাও যাতে তার আয় মুসলমানদের বেতন ভাতা ও বৃত্তি দেয়ার কাজে লাগে।" (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৪; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৫৯; কিতাবুল খারাজ, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২৭, ২৮, ৪৮)

এ কারণে হাসান বসরী বলেন ঃ শত্রুর শিবির থেকে যা হস্তগত হবে তা সেই সব সৈনিকদের হক য়ারা তা দখল করেছে। কিন্তু ভূমি সব মুসলমানের জন্য। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম ২৭) ইমাম আবু ইউসুফ বলেন ঃ "শত্রুসেনাদের কাছ থেকে যেসব জিনিস মুসলমানদের হস্তগত হবে এবং যেসব দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ও জীবজন্তু তারা কুড়িয়ে ক্যাম্পে আনবে তাহলো গনীমাত। এর মধ্য থেকে এক–পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৮) ইয়াহইয়া ইবনে আদমও এ মত পোষণ করেন এবং তা তিনি তাঁর গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ২৭) যে জিনিসটি 'গনীমাত ও ফাই'–এর পার্থক্য আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরে তা হলো, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ শেষে গনীমাতের সম্পদ বন্টন এবং বিজিত এলাকা যথারীতি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হওয়ার পর সায়েব ইবনে আকরা' নামক এক ব্যক্তি দুর্গের অভ্যন্তরে দু'টি থলি ভর্তি মণি মুক্তা কুড়িয়ে পান। এতে তার মনে খটকা সৃষ্টি হয় যে, তা 'গনীমাত' না 'ফাই'? গনীমাত হলে তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর 'ফাই' হলে তা বায়তুলমালে জমা হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় হাজির হলেন এবং বিষয়টি হযরত উমরের (রা) সামনে পেশ করলেন। হযরত উমর (রা) ফায়সালা করলেন যে, তা বিক্রি করে অর্থ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে। এ থেকে জানা গেল যে, শুধু এমন সব অস্থাবর সম্পদ গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে যা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের হস্তগত হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ স্থাবর সম্পদের মতই 'ফাই' হিসেবে গণ্য হয়। এ ঘটনাটি উল্লেখ করে ইমাম আবু উবায়েদ লিখছেন ঃ

مَا نِيْلَ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ عُنْوَةً قَسْرًا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ الْغَنِيْمَةُ – وَمَانِيْلَ مِنْهُمْ بَعْدُ مَا تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَتَصِيْرُ الدَّارُ دَارَ الْاِسْلَامِ – فَهُوَ فِئٌ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَامًّا وَلَا خُمُسَ فِيْهِ –

"যুদ্ধ চলাকালে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেসব সম্পদ শত্রুর কাছ থেকে হস্তগত হবে তা গনীমাত। আর যুদ্ধ শেষে দেশ দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার পর যেসব সম্পদ হস্তগত হবে তা 'ফাই' হিসেবে পরিগণিত হবে। এ সম্পদ দারুল ইসলামের অধিবাসীদের কল্যাণে কাজে লাগা উচিত। তাতে এক–পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট হবে না।" (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ২৫৪)

গনীমাতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত ও নির্দিষ্ট করার পর কাফেরদের কাছ থেকে মুসলমানদের হস্তগত হওয়া যেসব সম্পদ, বিষয়–সম্পত্তি ও জায়গা–জমি অবশিষ্ট থাকে তা প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, লড়াই করে হস্তগত করা সম্পদ ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় যাকে শক্তি বলে দখলকৃত দেশ বা অঞ্চল বলা হয়। দুই, সন্ধির ফলে যা মুসলমানদের হস্তগত হবে। এ সন্ধি মুসলমানদের সামরিক শক্তির প্রভাব, দাপট কিংবা ভীতির কারণে হলেও। বাহুবলে হস্তগত না হয়ে অন্য কোনভাবে হস্তগত হওয়া সম্পদও এরই মধ্যে অন্তরভুক্ত। মুসলিম ফকীহদের মধ্যে যা কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা প্রথম প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক শরয়ী মর্যাদা কি? কেননা, তা فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب –এর সংজ্ঞায় পড়ে না। এরপর

থাকে দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ। এ প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হলো, তা 'ফাই' হিসেবে গণ্য। কারণ এর বিধান কুরআন মজীদে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। পরে আমরা প্রথম প্রকারের সম্পদের শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১৩. এসব সম্পদ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন না করার কারণ কি এবং তার শরয়ী বিধান গনীমাত সম্পর্কিত বিধান থেকে ভিন্ন কেন পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে। এখন এসব সম্পদের হকদার কারা এ আয়াতটিতে তা বলা হয়েছে।

এসব সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। রসূলুল্লাহ (সা) এ নির্দেশ অনুসারে যেভাবে আমল করেছেন হযরত উমর (রা) থেকে মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান তা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ এ অংশ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ও পরিবার–পরিজনের খরচ নিয়ে নিতেন আর অবশিষ্ট অর্থ জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সওয়ারী জন্তু সংগ্রহ করতে ব্যয় করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি) নবীর (সা) ইন্তিকালের পর এ অংশটি মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো যাতে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজেই তা ব্যয়িত হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যে অংশটি বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ ইমামত বা নেতৃত্বের পদমর্যাদার জন্য তিনি এর হকদার ছিলেন, রিসালাতের পদমর্যাদার জন্য নয়। তবে শাফেয়ী ফিকাহবিদগণের অধিকাংশ এ ব্যাপারে অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহবিদগণের অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। অর্থাৎ এ অংশটি এখন আর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং তা মুসলমানদের দীনি ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয়িত হবে।

দ্বিতীয় অংশটি হলো আত্মীয়–স্বজনের জন্য। এর অর্থ রসূলের আত্মীয়–স্বজনের জন্য। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব। এ অংশটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ জন্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন নিজের এবং নিজের পরিবার–পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়–স্বজনের হকও আদায় করতে পারেন যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী অথবা তিনি নিজে যাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর এ অংশেরও ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশিষ্ট নেই। বরং মুসলমানদের অন্য সব মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের মত বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের অভাবী লোকদের অধিকারসমূহ ও বায়তুলমালের জিম্মাদারীতে চলে গিয়েছে। তবে যাকাতে তাদের অংশ না থাকার কারণে অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে প্রথম দু'টি অংশ বাতিল করে শুধু অবশিষ্ট তিনটি অংশের (ইয়াতীম, মিসকীন ও ইবনুস সাবীল) হকদারদের জন্য 'ফাই' নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর যুগে এ নীতি অনুসারে আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইমাম মুহাম্মাদ বাকেরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যদিও

হযরত আলীর (রা) আহলে বায়তের রায়ই [এ অংশ নবীর (সা) আত্মীয়–স্বজনের পাওয়া উচিত] তাঁর ব্যক্তিগত রায় ছিল। তথাপি তিনি হযরত আবু বকর ও উমরের (রা) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করা পছন্দ করেননি। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া বলেন ঃ নবীর (সা) পরে ঐ দু'টি অংশ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ ও যাবিল কুরবার অংশ) সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, প্রথম অংশটি হুজুরের (সা) খলীফার প্রাপ্য। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, দ্বিতীয় অংশটি হুজুরের (সা) আত্মীয়–স্বজনদের পাওয়া উচিত। অপর কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ছিল, দ্বিতীয় অংশটি খলীফার আত্মীয়–স্বজনদের দেয়া উচিত। অবশেষে এমতে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো যে, এ দু'টি অংশই জিহাদের প্রয়োজনে খরচ করা হবে। আতা ইবনে সায়েব বলেন ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর শাসনকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ এবং তাঁর আত্মীয়–স্বজনদের অংশ বনী হাশেমদের কাছে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, এ ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অনুসৃত কর্মনীতিই সঠিক ও নির্ভুল (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২১)। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যারা হাশেম ও মুত্তালিব বংশের লোক বলে প্রমাণিত কিংবা সাধারণভাবে সবার কাছে পরিচিত তাদের সচ্ছল ও অভাবী উভয় শ্রেণীর লোককেই 'ফাই'–এর সম্পদ থেকে দেয়া যেতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ) হানাফীদের মতে, এ অর্থ থেকে কেবল তাদের অভাবীদের সাহায্য করা যেতে পারে। অবশ্য অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। (রুহুল মায়ানী) ইমাম মালেকের মতে এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। যে খাতে ইচ্ছা সরকার তা ব্যয় করতে পারেন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ্‌শারহিল কাবীর)

অবশিষ্ট তিনটি অংশ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী এবং অন্য তিনজন ইমামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে 'ফাই'–এর সমস্ত অর্থ–সম্পদ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ উপরোক্ত খাতসমূহে এমনভাবে খরচ করা উচিত যেন তার $\frac{১}{৫}$ সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে, $\frac{১}{৫}$ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের জন্য, $\frac{১}{৫}$ ইয়াতীমদের জন্য, $\frac{১}{৫}$ মিসকীনদের জন্য এবং $\frac{১}{৫}$ মুসাফিরদের জন্য ব্যয়িত হয়। অপরদিকে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ এভাবে বন্টনের পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে, 'ফাই'–এর সমস্ত অর্থ–সম্পদই সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। (মুগনিউল মুহতাজ)

১৪. এটি কুরআন মজীদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক আয়াতসমূহের একটি। এতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির একটি মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গোটা সমাজে ব্যাপকভাবে সম্পদ আবর্তিত হতে থাকা উচিত। এমন যেন না হয় অর্থ–সম্পদ কেবল ধনবান ও বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে। কিংবা ধনী দিনে দিনে আরো ধনশালী হতে থাকবে আর গরীব দিনে দিনে আরো বেশী গরীব হতে থাকবে। কুরআন মজীদে এ নীতি শুধু বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং এ উদ্দেশ্যে সুদ হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরয করা হয়েছে, গনীমাতের

সম্পদ থেকে এক–পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন আয়াতে নফল সাদকা ও দান–খয়রাতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কাফ্ফারা আদায়ের এমন সব পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ সমাজের দরিদ্র মানুষদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে। উত্তরাধিকারের জন্য এমন আইন রচনা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যেন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে, কার্পণ্য ও বখিলীকে নৈতিক বিচারে কঠোরভাবে নিন্দনীয় এবং দানশীলতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে প্রশংসা করা হয়েছে আর সচ্ছল শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে যাকে খয়রাত মনে করে নয় বরং তাদের অধিকার মনে করে আদায় করা উচিত। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড় খাত অর্থাৎ 'ফাই' সম্পর্কে এমন একটি আইন রচনা করা হয়েছে যে, এর একটি অংশ যেন অনিবার্যরূপে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে সহায়তা দানের জন্য ব্যয়িত হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত দু'টি একটি যাকাত এবং অন্যটি 'ফাই'। মুসলমানদের নিসাবের অতিরিক্ত পুঁজি, গবাদি পশু, ব্যবসায় পণ্য এবং কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য থেকে আদায় করা হয়, আর এর বেশীর ভাগই গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট। আর 'ফাই'–এর মধ্যে জিযিয়া ও ভূমি রাজস্ব সহ সেই সব আয়ও অন্তরভুক্ত যা অমুসলিমদের নিকট থেকে আসে। এরও বেশীর ভাগ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়েরই স্পষ্ট ইংগিত যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে তার আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের গোটা আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যেন ধন–সম্পদের উপায়–উপকরণের ওপর বিত্তবান এবং প্রভাবশালী লোকদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পদের প্রবাহ গরীবদের দিক থেকে ধনীদের দিকে ঘুরে না যায় আর বিত্তশালীদের মধ্যেই যেন আবর্তিত হতে না থাকে।

১৫. বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকে এ আয়াতের অর্থ হলো, বনী নাযীর গোত্র থেকে লব্ধ সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে লব্ধ 'ফাই'–এর সম্পদের বিলি–বন্টনের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা কোন প্রকার আপত্তি ও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই মেনে নাও। তিনি যাকে যা দেবেন সে তা গ্রহণ করবে এবং যা কাউকে দেবেন না সে জন্য যেন সে আপত্তি বা দাবী উত্থাপন না করে। কিন্তু নির্দেশটির ভাষা যেহেতু ব্যাপকতাবোধক, তাই এ নির্দেশ শুধু 'ফাই' সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অভিপ্রায় হলো, মুসলমান সব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে। এ অভিপ্রায়কে আরো স্পষ্ট করে দেয় এ বিষয়টি যে, "রসূল তোমাদের যা কিছু দেন" কথাটির বিপরীতে "যা কিছু না দেন" বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, "যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে বিরত থাকো।" এ নির্দেশের লক্ষ যদি শুধু 'ফাই' –এর সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হতো তা হলে 'যা দেন' কথাটির বিপরীতে 'যা না দেন' বলা হতো। এ ক্ষেত্রে নিষেধ করা বা বিরত রাখা কথাটির ব্যবহার দ্বারা আপনা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নির্দেশের লক্ষ ও উদ্দেশ্য নবীর (সা) আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ
الصّٰدِقُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ
عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٩﴾

(তাছাড়াও এ সম্পদ) সেই সব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর–বাড়ী ও বিষয়–সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।[১৬] এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক। (আবার তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরাতে বসবাস করছিলো।[১৭] তারা ভালবাসে সেই সব লোকদের যারা হিজরাত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে।[১৮] মূলত যেসব লোককে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।[১৯]

নিজেও একথাটি বলেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ - (بخارى - مسلم)

"আমি কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দিলে তা যথাসাধ্য পালন করো। আর যে বিষয়ে বিরত থাকতে বলি তা থেকে দূরে থাকো।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বক্তৃতাকালে বললেন : "আল্লাহ তা'আলা অমুক অমুক ফ্যাশনকারীনী মহিলাকে লা'নত করেছেন।" এই বক্তৃতা শুনে এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল : একথা আপনি কোথায়

পেয়েছেন? আল্লাহর কিতাবে তো এ বিষয়টি আমি কোথাও দেখি নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকলে একথা অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا পড়েছো? সে বললো ঃ হাঁ, এ আয়াত তো আমি পড়েছি। হযরত আবদুল্লাহ বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ কাজে লিপ্ত নারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। মহিলাটি বললোঃ এখন আমি বুঝতে পারলাম। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম।)

১৬. এ কথা দ্বারা সেই সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঐ সময় মক্কা মুয়াযযামা ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনী নাযীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এসব মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব অর্থ-সম্পদ এখন হস্তগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হবে তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাথে সাথে এসব লোকেরও অধিকার আছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন সব লোকদের সহযোগিতা দেয়া উচিত যারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর দীনের জন্য হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছে এবং দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাযীরের সম্পদের একটি অংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং আনসারগণ যেসব খেজুর বাগান তাদের মুহাজির ভাইদের সাহায্যের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, 'ফাই'-এর সম্পদে মুহাজিরদের এ অংশ কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে তাদের পুনর্বাসিত করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। তাই তার উচিত যাকাত ছাড়া 'ফাই'-এর সম্পদও এ খাতে খরচ করা।

১৭. এখানে আনসারদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই' অর্থ-সম্পদে শুধু মুহাজিরদের অধিকার নেই। বরং আগে থেকেই যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করে আসছে তারাও এতে অংশ লাভের অধিকারী।

১৮. এটা মদীনা তাইয়্যেবার আনসারদের পরিচয় ও প্রশংসা। মুহাজিরগণ মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে হিজরত করে তাঁদের শহরে আসলে তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব দিলেন, আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ওগুলো আমাদের এবং এসব মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন। নবী (সা) বললেন ঃ এসব লোক তো বাগানের কাজ জানে না। তারা এমন এলাকা থেকে এসেছে যেখানে বাগান নেই। এমন কি হতে পারে না, এসব বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগানে তোমরাই কাজ করো এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ এদের দাও। তারা বললো ঃ سمعنا واطعنا আমরা মেনে নিলাম। (বুখারী, ইবনে জারীর) এতে মুহাজিরগণ বলে উঠলেন ঃ এ রকম আত্মত্যাগী মানুষ তারা আর কখনো দেখেনি। এরা নিজেরা কাজ

করবে অথচ আমাদেরকে অংশ দেবে। আমাদের তো মনে হচ্ছে, সমস্ত সওয়াব তারাই লুটে নিয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ তা নয়, যতক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে ততক্ষণ তোমরাও সওয়াব পেতে থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ) অতপর বনী নাযীরের এলাকা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন একটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমাদের বিষয়-সম্পদ এবং ইহুদীদের পরিত্যক্ত ফল-ফলাদি ও খেজুর বাগান মিলিয়ে একত্রিত করে সবটা তোমাদের ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক । আরেকটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমরা তোমাদের বিষয়-সম্পদ নিজেরাই ভোগ দখল করো আর পরিত্যক্ত এসব ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক। আনসারগণ বললেন ঃ এসব বিষয়-সম্পদ আপনি তাদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিন। আর আপনি চাইলে আমাদের বিষয়-সম্পদেরও যতটা ইচ্ছা তাদের দিয়ে দিতে পারেন। এতে হযরত আবু বকর চিৎকার করে উঠলেন ঃ جزاكم الله يامعشر الانصار خيرا "হে আনসারগণ, আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।" (ইয়াহইয়া ইবনে আদম, বালাযুরী) এভাবে আনসারদের সমতির ভিত্তিতেই ইহুদীদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। আনসারদের মধ্যে থেকে শুধু হযরত আবু দুজানা, হযরত সাহল ইবনে সা'দ এবং কারো কারো বর্ণনা অনুসারে হযরত হারেস ইবনুস্ সিমাকে অংশ দেয়া হলো। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। (বালাযুরী, ইবনে হিশাম, রূহুল মায়ানী) বাহরাইন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে সময়ও আনসারগণ এই ত্যাগের প্রমাণ দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অঞ্চলের বিজিত ভূমি শুধু আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। কিন্তু আনসারগণ বললেন ঃ যতক্ষণ আমাদের সমপরিমাণ অংশ আমাদের ভাই মুহাজিরদের দেয়া না হবে ততক্ষণ আমরা এ সম্পদের কোন অংশ গ্রহণ করবো না। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম) আনসারদের এ সব ত্যাগের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন।

১৯. 'রক্ষা পেয়েছে' না বলে বলা হয়েছে 'রক্ষা করা হয়েছে'। কেননা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া কেউ নিজ বাহু বলে মনের ঔদার্য ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। এটা আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই কেবল কারো ভাগ্যে জুটে থাকে। شح শব্দটি আরবী ভাষায় অতি কৃপণতা ও বখিলী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটিকে যখন نفس শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে شح النفس বলা হয় তখন তা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখিলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বরং কৃপণতার মূল উৎস এটিই। এই বৈশিষ্টের কারণে মানুষ অন্যের অধিকার স্বীকার করা এবং তা পূরণ করা তো দূরের কথা তার গুণাবলী স্বীকার করতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করে। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক। অন্য কেউ যেন কিছুই না পায়। নিজে অন্যদের কিছু দেয়া তো দূরের কথা, অপর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু দেয় তাহলেও সে মনে কষ্ট পায়। তার লালসা শুধু নিজের অধিকার নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট নয়, বরং অন্যদের অধিকারেও সে হস্তক্ষেপ করে, কিংবা অন্ততপক্ষে সে চায় তার চারদিকে ভাল বস্তু যা আছে তা সে নিজের জন্য দু'হাতে লুটে নেবে অন্য কারো জন্য কিছুই রাখবে না। এ কারণে এ জঘন্য স্বভাব থেকে রক্ষা পাওয়াকে কুরআন মজীদে সাফল্যের গ্যারান্টি বলে

وَالَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

(তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে।[২০] যারা বলে ঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।[২১]

আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটিকে মানুষের নিকৃষ্টতম স্বভাব বলে গণ্য করেছেন যা বিপর্যয়ের উৎস। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اِتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ (مسلم - مسند احمد - بيهقى - بخارى فى الادب)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

اَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا - وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا (مسند احمد - ابو داؤد - نسائى)

অর্থাৎ شح থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে। এটিই তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের মর্যাদাহানি নিজের জন্য বৈধ মনে করে নিতে মানুষকে প্ররোচিত করেছে। এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা জুলুম করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তাই তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ঈমান ও মনের সংকীর্ণতা একই সাথে কারো মনে অবস্থান করতে পারে না। (ইবনে আবি শায়বা, নাসায়ী, বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান, হাকেম) হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ দুইটি স্বভাব এমন যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃপণতা ও দুশ্চরিত্রতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ফিল আদাব) কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কথা বাদ

দিলে পৃথিবীতে জাতি হিসেবে মুসলমানরা আজও সবচেয়ে বেশী দানশীল ও উদারমনা। সংকীর্ণমন্যতা ও কৃপণতার দিক দিয়ে যেসব জাতি পৃথিবীতে নজিরবিহীন সেই সব জাতির কোটি কোটি মুসলমান তাদের স্বগোত্রীয় অমুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করছে। হৃদয়–মনের ঔদার্য ও সংকীর্ণতার দিক দিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অবদান। এ ছাড়া তার অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। এ শিক্ষাই মুসলমানদের হৃদয়–মনকে বড় করে দিয়েছে।

২০. এ পর্যন্ত যেসব বিধি–বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তাতে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'ফাই'–এর সম্পদে আল্লাহ, রসূল, রসূলের আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, মুহাজির, আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মুসলমানের অধিকার আছে। এটি কুরআন মজীদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত যার আলোকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক, শাম ও মিসরের বিজিত এলাকাসমূহের ভূমি ও অর্থ–সম্পদ এবং ঐ সব দেশের পূর্বতন সরকার ও তার শাসকদের বিষয়–সম্পদের নতুনভাবে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব অঞ্চল বিজিত হলে হযরত যুবায়ের, হযরত বেলাল, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং হযরত সালমান ফারসী সহ বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক সাহাবী অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন যে, যেসব সৈন্য লড়াই করে এসব এলাকা জয় করেছে এসব তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। তাঁদের ধারণা ছিল এসব সম্পদ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ এর সংজ্ঞায় পড়ে না। বরং মুসলমানরা তাদের ঘোড়া এবং উট পরিচালনা করে এসব করায়ত্ত করেছে। তাই যেসব শহর ও অঞ্চল যুদ্ধ ছাড়াই বশ্যতা স্বীকার করেছে সেইগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বিজিত অঞ্চল গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে। আর তার শরয়ী বিধান হলো, ঐ সব অঞ্চলের ভূমি ও অধিবাসীদের এক–পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে এবং অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কিন্তু এই মতটি সঠিক ছিল না। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে যুদ্ধ করে যেসব এলাকা দখল করা হয়েছিলো তিনি তার কোনটিরই ভূমি ও বাসিন্দাদের থেকে গনীমাতের মত এক–পঞ্চমাংশ বের করে রেখে অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন না। তাঁর যুগের দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, মক্কা ও খায়বার বিজয়। এর মধ্যে পবিত্র মক্কাকে তিনি অবিকল তার বাসিন্দাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর থাকলো খায়বারের বিষয়টি। এ সম্পর্কে হযরত বুশাইর ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) খায়বারকে ৩৬টি অংশে ভাগ করলেন। তার মধ্য থেকে ১৮ অংশ সামষ্টিক ও সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখে অবশিষ্ট ১৮ অংশ সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (আবু দাউদ, বায়হাকী, কিতাবুল আমওয়াল–আবু উবায়েদ; কিতাবুল খারাজ—ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম; ফুতূহুল বুলদান—বালাযুরী; ফাতহুল কাদীর—ইবনে হুমাম) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছিলো যে, যুদ্ধ করে জয় করা হলেও বিজিত ভূমির বিধান গনীমাতের বিধানের মত নয়। তা না হলে পবিত্র মক্কাকে পুরোপুরি তার অধিবাসীদের কাছে ফেরত দেয়া এবং খায়বারের এক–পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পরিবর্তে তার পুরা অর্ধেকটা অংশ সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বায়তুলমালে নিয়ে নেয়া কি করে সম্ভব হলো? অতএব, সুন্নাত তথা রসূলের কাজকর্ম দ্বারা যা প্রমাণিত তাহলো, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলসমূহের

ব্যাপারে পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও এখতিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের আছে। তিনি তা বন্টনও করতে পারেন, আর পবিত্র মক্কার মত কোন অস্বাভাবিক প্রকৃতির এলাকা যদি হয় তাহলে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি ইহসানও করতে পারেন, নবী (সা) যেমনটি মক্কাবাসীদের প্রতি করেছিলেন।

কিন্তু নবীর (সা) যুগে যেহেতু ব্যাপক এলাকা বিজিত হয়নি এবং বিভিন্ন প্রকারের বিজিত অঞ্চলের আলাদা আলাদা বিধান সুস্পষ্টভাবে লোকের সামনে আসেনি। তাই হযরত উমরের (রা) যুগে বড় বড় দেশ ও অঞ্চল বিজিত হলে সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ সমস্যা দেখা দিলো যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত এসব অঞ্চল গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে না 'ফায়' হিসেবে গণ্য হবে? মিসর বিজয়ের পর হযরত যুবায়ের দাবী করলেন যে,

اَقْسِمْهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ-

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে খায়বর এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন অনুরূপ এই গোটা অঞ্চল ভাগ করে দিন।" (আবু উবায়েদ)

শাম ও ইরাকের বিজিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে হযরত বেলাল (রা) জোর দিয়ে বললেন যে,

اَقْسِمِ الْاَرْضِيْنَ بَيْنَ الَّذِيْنَ افْتَتَحُوْهَا كَمَا تُقَسِّمُ غَنِيْمَةَ الْعَسْكَرِ

"যেভাবে গনীমাতের সম্পদ ভাগ করা হয় ঠিক সেভাবে সমস্ত বিজিত ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দিন।" (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ)

অপর দিকে হযরত আলীর (রা) মত ছিল এই যে,

دَعْهُمْ يَكُوْنُوْا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ

"এসব ভূমি এর চাষাবাদকারীদের কাছে থাকতে দিন যেন তা মুসলমানদের আয়ের একটা উৎসে হয়ে থাকে"। (আবু ইউসুফ, আবু উবায়েদ)

অনুরূপ হযরত মু'য়ায ইবনে জাবালের মত ছিল এই যে, আপনি যদি এসব বন্টন করে দেন তাহলে তার পরিণাম খুবই খারাপ হবে। এ বন্টনের ফলে বড় বড় সম্পদ ও সম্পত্তি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের করায়ত্ত হয়ে পড়বে যারা এসব অঞ্চল জয় করেছে। পরে এসব লোক দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে আর তাদের বিষয়-সম্পদ তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছেই থেকে যাবে। অনেক সময় হয়তো একজন মাত্র নারী বা পুরুষ হবে এই উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য কিছুই থাকবে না। তাই আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের সংরক্ষণ সমানভাবে হতে পারে (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা—৫৯; ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা—১৩৮)। গোটা ইরাক বন্টন করে দিলে মাথাপিছু কি পরিমাণ অংশ হয় হযরত উমর (রা) তা হিসেব করে দেখলেন। তিনি জানতে পারলেন, গড়ে মাথাপিছু দুই তিন ফাল্লাহ করে পড়ে, (আবু

ইউসুফ, আবু উবায়েদ) অতপর তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ঐ সব এলাকা বন্টিত না হওয়া উচিত। সুতরাং বন্টনের দাবীদার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে তিনি যেসব জওয়াব দিয়েছিলেন তাহলো ঃ

تُرِيْدُوْنَ اَنْ يَاْتِىَ اٰخِرُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ (ابو عبيد)

"আপনারা কি চান, পরবর্তী লোকদের জন্য কিছুই না থাক?"

فَكَيْفَ بِمَنْ يَاْتِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَجِدُوْنَ الْاَرْضَ بِعُلُوْجِهَا قَدِ اقْتُسِمَتْ وَوُرِّثَتْ عَنِ الْاٰبَاءِ وَحِيْزَتْ ؟ مَاهٰذَا بِرَأْىٍ (ابو يوسف)

"পরবর্তীকালের মুসলমানদের কি উপায় হবে? তারা এসে দেখবে ভূমি কৃষকসহ আগে থেকেই বন্টিত হয়ে আছে এবং মানুষ বাপ–দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা ভোগ দখল করছে? তা কখনো হতে পারে না।"

فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَخَافُ اِنْ قَسَّمْتُهُ اَنْ تُفَاسِدُوْا بَيْنَكُمْ فِى الْمِيَاهِ (ابو عبيد)

"তোমাদের পরে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য কি থাকবে? তাছাড়া আমার আশংকা হয় যদি আমি এসব বন্টন করে দেই তাহলে পানি নিয়ে তোমরা পরস্পর ঝগড়া–বিবাদে লিপ্ত হবে।"

لَوْلَا اٰخِرُ النَّاسِ مَافَتَحْتُ قَرْيَةً اِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ (بخارى ، مؤطا ، ابو عبيد)

"পরবর্তী লোকদের চিন্তা যদি না হতো তাহলে যে জনপদই আমি জয় করতাম তা ঠিক সেভাবে বন্টন করতাম যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বন্টন করেছিলেন।"

لَا هٰذَا عَيْنُ الْمَالِ وَلٰكِنِّىْ اَحْبِسُهُ فِيْمَا يَجْرِىْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (ابو عبيد)

"না, এটাই তো মূল সম্পদ (Real estate) আমি তা ধরে রাখবো যাতে তা দিয়ে বিজয়ী সৈনিক ও সাধারণভাবে মুসলমানদের সবার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।"

কিন্তু এসব জওয়াব শুনেও লোকজন সন্তুষ্ট হলো না। তারা বলতে শুরু করলো যে, আপনি জুলুম করছেন। অবশেষে হযরত উমর (রা) মজলিসে শুরার অধিবেশন ডাকলেন এবং তাদের সামনে এ বিষয়টি পেশ করলেন। এই সময় তিনি যে ভাষণ দান করেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

আমি আপনাদেরকে শুধু এ জন্য কষ্ট দিয়েছি যে, আপনাদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার যে দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সেই আমানত রক্ষা করার ব্যবস্থাপনায় আমার সাথে আপনারাও শরীক হবেন। আমি আপনাদেরই একজন। আর আপনারা সেই সব ব্যক্তি যারা আজ সত্যকে মেনে চলছেন। আপনাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন। আর যার ইচ্ছা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন। আমি চাই না, আপনারা আমার ইচ্ছার অনুসরণ করেন। আপনাদের কাছে ন্যায় ও সত্য বিধানদাতা আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোন কিছু করার জন্য কোন কথা বলে থাকি তাহলে সে ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই ....। আপনারা তাদের কথা শুনেছেন যাদের ধারণা হলো আমি তাদের প্রতি জুলুম করছি এবং তাদের হক নষ্ট করতে চাচ্ছি। অথচ কারো প্রতি জুলুম করা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। যা তাদের জুলুম করে আমি যদি তা তাদের না দিয়ে অন্য কাউকে দেই তাহলে সত্যি সত্যিই আমি বড় হতভাগ্য। আমি দেখতে পাচ্ছি কিসরার দেশ ছাড়া বিজিত হওয়ার মত আর কোন অঞ্চল এখন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরানীদের ধন–সম্পদ, তাদের ভূমি এবং কৃষক সবই আমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। আমাদের সৈনিকরা যেসব গনীমাত লাভ করেছিল তার এক–পঞ্চমাংশ আলাদা করে আমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি। আর গনীমাতের যেসব সম্পদ এখনো বন্টিত হয়নি আমি সেগুলোও বন্টন করার চিন্তা–ভাবনা করছি। তবে ভূমি সম্পর্কে আমার মত হলো, ভূমি ও এর চাষাবাদকারীদের বন্টন করবো না। বরং ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমি–রাজস্ব এবং কৃষকদের ওপর জিযিয়া আরোপ করবো। তারা সবসময় এগুলো দিতে থাকবে। এই অর্থ বর্তমানকালের সব মুসলমান, যুদ্ধরত সৈনিক, মুসলমানদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য 'ফাই' হিসেবে গণ্য হবে। আপনারা কি দেখছেন না আমাদের সীমান্তসমূহ রক্ষার জন্য লোকের অপরিহার্য প্রয়োজন? আপনারা কি দেখছেন না, এসব বড় বড় দেশ—সিরিয়া, আলজিরিয়া, কূফা, বসরা, মিসর এসব স্থানে সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকা দরকার এবং নিয়মিতভাবে তাদের বেতনও দেয়া দরকার? চাষাবাদকারী সহ এসব ভূমি যদি আমি বন্টন করে দেই তাহলে এসব খাতে ব্যয়ের অর্থ কোথা থেকে আসবে?

দুই তিন দিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা ও যুক্তি–তর্ক চলতে থাকলো। হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত উমরের (রা) মত সমর্থন করলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না। অবশেষে হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি দলীল পেয়ে গিয়েছি যা এ সমস্যার সমাধান দেবে। এরপর তিনি সূরা হাশরের এই আয়াত কয়টি অর্থাৎ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ থেকে رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত পড়লেন এবং তা থেকে এ দলীল পেশ করলেন যে, আল্লাহর দেয়া এসব সম্পদে শুধু এ যুগের লোকদেরই অংশ ও অধিকার বর্তায় না। বরং তাদের সাথে আল্লাহ পরবর্তীকালের লোকদেরও শরীক করেছেন। তাই 'ফাই'য়ের যে সম্পদ সবার জন্য; পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তার কিছুই না রেখে সবই কেবল এসব বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে আমি বন্টন করে দেব, তা কি করে সঠিক হতে পারে? তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "যাতে এ সব

সম্পদ শুধু তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যে আবর্তিত হতে না থাকে।" কিন্তু আমি যদি কেবল বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যেই তা বন্টন করে দেই তাহলে তা তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে, অন্যদের জন্য কিছুই থাকবে না। এই যুক্তি ও প্রমাণ সবাইকে সন্তুষ্ট করলো, আর এ বিষয়ে 'ইজমা' বা ঐকমত্য হয়ে গেল যে, বিজিত গোটা এলাকা সকল মুসলমানের স্বার্থে 'ফাই' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যেসব লোক এখানে কাজ করছে তাদের হাতেই এসব ভূমি থাকতে দেয়া হবে এবং তার ওপর ভূমি রাজস্ব ও জিযিয়া আরোপ করতে হবে। (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ২৭ ও ৩৫; আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত ভূমির প্রকৃত যে মর্যাদা স্থিরিকৃত হলো তাহচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম মিল্লাত হবে এর মালিক, আগে থেকেই যারা এসব ভূমিতে কাজ করে আসছে মুসলিম মিল্লাত তার নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে চাষাবাদকারী হিসেবে বহাল রেখেছে, এসব ভূমি বাবদ তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট একটা হারে খাজনা বা ভূমি রাজস্ব দিতে থাকবে, চাষাবাদের এই অধিকার বংশানুক্রমিকভাবে তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হতে থাকবে এবং এ অধিকার তারা বিক্রি করতেও পারবে। কিন্তু তারা ভূমির প্রকৃত মালিক হবে না, এর প্রকৃত মালিক হবে মুসলিম মিল্লাত। ইমাম আবু উবায়েদ তাঁর আল আমওয়াল গ্রন্থে আইনগত এই মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

اَقَرَّ اَهْلَ السَّوَادِ فِىْ اَرْضِيْهِمْ وَضَرَبَ عَلَى رُؤُسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى اَرْضِيْهِمْ الطَّسَقَ (ص - ٥٧)

"হযরত উমর (রা) ইরাকবাসীদের তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখলেন, তাদের সবার ওপর মাথা পিছু জিযিয়া আরোপ করলেন এবং ভূমির ওপর ট্যাক্স ধার্য করলেন।"

وَاِذَا اَقَرَّ الاِمَامُ اَهْلَ الْعَنْوَةِ فِىْ اَرْضِهِمْ تَوَارَثُوْهَا وَتَبَايَعُوْهَا (ص- ٨٤)

"ইমাম (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান) বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের যদি তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখেন তাহলে তারা ঐ সব ভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর করতে এবং বিক্রি করতে পারবে।"

উমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে শা'বীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, ইরাকের অধিবাসীদের সাথে কোন চুক্তি আছে কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, চুক্তি নেই। তবে তাদের নিকট থেকে যখন ভূমি রাজস্ব গ্রহণ করা হয়েছে তখন তা চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৪৯; আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৮)।

হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে উৎবা ইবনে ফারকাদ ফোরাত নদীর তীরে একখণ্ড জমি কিনলেন। হযরত উমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এ জমি কার নিকট থেকে কিনেছো? তিনি বললেন ঃ জমির মালিকের নিকট থেকে। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ তার মালিক তো এসব লোক (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার)।

رَأَى عُمَرَ اَنَّ اَصْلَ الاَرْضِ لِلْمُسْلِمِيْنَ হযরত উমরের (রা) অভিমত ছিল এই যে, ঐ সব ভূমির প্রকৃত মালিক মুসলমানগণ— (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৭৪)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত দেশসমূহের যেসব সম্পদ মুসলমানদের সমষ্টিগত মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো তা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) কোন সন্ধিচুক্তির ফলে যেসব ভূমি ও অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তগত হবে।

(২) যুদ্ধ ছাড়াই কোন এলাকার লোক মুসলমানদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে যে মুক্তিপণ (فديه), ভূমি রাজস্ব (خراج) এবং জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হবে।

(৩) যেসব জমি ও সম্পদের মালিক তা ফেলে পালিয়ে গিয়েছে।

(৪) যেসব সম্পদের মালিক মারা গেছে বা যেসব সম্পদের কোন মালিক নেই।

(৫) যেসব ভূমি পূর্বে কারো অধিকারে ছিল না।

(৬) যেসব ভূমি আগে থেকে মানুষের অধিকারে ছিল। কিন্তু তার সাবেক মালিকদেরকেই বহাল রেখে তাদের ওপর জিযিয়া ও ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করা হয়েছে।

(৭) পূর্ববর্তী শাসক পরিবারসমূহের জায়গীরসমূহ।

(৮) পূর্ববর্তী সরকারসমূহের মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তি। —বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৮; কিতাবুল খারাজ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২২-৬৪, মুগনিউল মুহতাজ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩; হাশিয়াতুদ দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০; গায়াতুল মুনতাহা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৭-৪৭১)।

এসব জিনিস যেহেতু সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 'ফাই' বলে ঘোষিত হয়েছিলো, তাই একে 'ফাই' বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে ও ইসলামের ফিকাহবিদদের মধ্যে নীতিগত ঐক্য বিদ্যমান। তবে কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য আছে। আমরা ঐগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নীচে বর্ণনা করলাম।

হানাফীগণ বলেন ঃ বিজিত দেশ ও অঞ্চলসমূহের ভূমির ব্যাপারে ইসলামী সরকারের (ফিকাহবিদদের পরিভাষায় ইমাম) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে এর মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট সবটা বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। কিংবা পূর্ববর্তী মালিকদের অধিকারে রেখে দেবেন, আর তার মালিকদের ওপরে জিযিয়া এবং ভূমির ওপরে খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করবেন। এ অবস্থায় এসব সম্পদ মুসলমানদের জন্য স্থায়ী ওয়াকফ সম্পদ বলে গণ্য হবে। (বাদায়েউস সানায়ে, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস, শারহুল এনায়া আলাল হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম সুফিয়ান সাওরী থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক এ মতটিই উদ্ধৃত করেছেন। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়েদ)

মালেকীগণ বলেন ঃ মুসলমানদের শুধু দখল করে নেয়ার কারণেই এসব ভূমি আপনা-আপনি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যায়। তা ওয়াকফ করার জন্য ইমামের

সিদ্ধান্ত বা মুজাহিদদের রাজি করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া মালেকীগণের সর্বজন পরিজ্ঞাত মত হলো, বিজিত এলাকার শুধু ভূমিই নয়, বরং ঘরবাড়ী, দালানকোঠাও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ। তবে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার ঐগুলোর জন্য ভাড়া ধার্য করবে না । (হাশিয়াতুদ দুসূকী)

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এতটুকু বিষয়ে হানাফীদের সাথে একমত যে, ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা কিংবা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়া ইমামের ইখতিয়ারাধীন। তারা মালেকীদের সংগে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, বিজিত অঞ্চলসমূহের ঘরবাড়ী ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হলেও তার ওপর ভাড়া ধার্য করা হবে না। (গায়াতুল মুনতাহা—হাম্বলী মযহাবের যেসব মত ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে ফতোয়া দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থখানি তারই সমষ্টি। দশম শতাব্দী থেকে এ মযহাবের সমস্ত ফতোয়া এ গ্রন্থ অনুসারেই দেয়া হয়ে থাকে।)।

শাফেয়ী মযহাবের মত হলো ঃ বিজিত অঞ্চলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি গনীমাত এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি ও ঘরবাড়ী) 'ফাই' হিসেবে গণ্য করা হবে। (মুগনিউল মুহ্তাজ)

কোন কোন ফিকাহবিদ বলেন ঃ ইমাম যদি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত দেশের বা অঞ্চলের ভূমি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করতে চান তাহলে তাঁকে অবশ্যই বিজয়ী সৈনিকদের সম্মতি নিতে হবে। এর সপক্ষে তারা এ দলীল পেশ করেন, ইরাক জয়ের পূর্বে হযরত উমর (রা) জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীকে এ মর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, বিজিত অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশ তাঁকে দেয়া হবে। কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ লোক ছিল জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীর গোত্রের লোক। সুতরাং ২-৩ বছর পর্যন্ত এ অংশ তাঁর কাছেই ছিল। পরে হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ

لَوْلَا اَنِّىْ قَاسِمٌ مَسْئُوْلٌ لَكُنْتُمْ عَلٰى مَا جُعِلَ لَكُمْ وَاَرَى النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا فَاَرَىٰ اَنْ تَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ -

"বন্টনের ব্যাপারে আমি যদি দায়িত্বশীল না হতাম এবং আমাকে জবাবদিহি করতে না হতো তাহলে তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তোমাদের কাছেই থাকতে দেয়া হতো। কিন্তু এখন আমি দেখছি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমার মত হলো তোমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে তা ফিরিয়ে দাও।"

হযরত জারীর (রা) তাঁর এ কথা মেনে নিলেন। এ কারণে হযরত উমর (রা) তাঁকে পুরস্কার হিসেবে ৮০ দিনার প্রদান করলেন। (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়েদ)। এ ঘটনা দ্বারা তারা প্রমাণ দেন যে, হযরত উমর বিজয়ী সৈন্যদের সম্মত করার পর বিজিত অঞ্চলসমূহ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ফিকাহবিদদের অধিকাংশই এ যুক্তি মেনে নেননি। কারণ সকল বিজিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে সমস্ত বিজয়ী সৈনিকদের নিকট থেকে এ ধরনের কোন সম্মতি নেয়া হয়নি। আর কেবল হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহর সাথে এ আচরণ করা হয়েছিল

শুধু এ কারণে যে, বিজয়ের পূর্বে বিজিত ভূমি সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রা) তাঁর সাথে এ মর্মে একটি অঙ্গীকার করে ফেলেছিলেন। সেই অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই তাঁকে তাঁর সম্মতি নিতে হয়েছিল। তাই এটাকে কোন ব্যাপকভিত্তিক আইন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

ফিকাহবিদদের আরেকটি গোষ্ঠী বলেন ঃ ওয়াকফ ঘোষণা করার পরও বিজিত এ সব ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে যে কোন সময় বন্টন করে দেয়ার ইখতিয়ার সরকারের থেকে যায়। এর সপক্ষে তারা যে রেওয়ায়াত থেকে দলীল পেশ করেন তাহলো, একবার হযরত আলী (রা) লোকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ

لَوْلَا اَنْ يَّضْرِبَ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ لَقَسَّمْتُ السَّوَادَ بَيْنَكُمْ

"যদি আমি এ আশংকা না করতাম যে, তোমরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে তাহলে এসব প্রত্যন্ত অঞ্চল আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।" (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল— আবু উবায়েদ)।

কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদ এমতটিও গ্রহণ করেননি। বরং তাদের সর্বসম্মত মত হলো, জিযিয়া ও খারাজ ধার্য করে বিজিত এলাকার ভূমি একবার যদি উক্ত এলাকার অধিবাসীদের অধিকারেই রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায় না। এরপর থাকে হযরত আলীর (রা) সাথে সম্পর্কিত কথাটি। এ সম্পর্কে আবু বকর জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ঐ রেওয়ায়াত সঠিক নয়।

২১. 'ফাই'–এর সম্পদ উপস্থিত ও বর্তমান কালের বিদ্যমান মুসলমানদেরই কেবল নয়, বরং অনাগত কালের মুসলমান এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অংশ আছে। এ আয়াতের মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য এ বিষয়টি তুলের ধরা হলেও একই সাথে এর মধ্যে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। তাহলো, কোন মুসলমানের মনে অপর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা–বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকা উচিত। আর মুসলমানদের জন্য সঠিক জীবনাচার হলো, তারা তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ভাইদের লা'নত বা অভিশাপ দেবে না কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবে না। বরং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকবে। যে বন্ধন মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কিত করেছে তাহলো ঈমানের বন্ধন। কোন ব্যক্তির অন্তরে অন্য সব জিনিসের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব যদি অধিক হয় তাহলে যারা ঈমানের বন্ধনের ভিত্তিতে তার ভাই, সে অনিবার্যভাবেই তাদের কল্যাণকামী হবে। তাদের জন্য অকল্যাণ, হিংসা–বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কেবল তখনই তার অন্তরে স্থান পেতে পারে যখন ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা তার দৃষ্টিতে কমে যাবে এবং অন্য কোন জিনিসকে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। তাই ঈমানের সরাসরি দাবী, একজন মু'মিনের অন্তরে অন্য কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা–বিদ্বেষ থাকবে না। নাসায়ী কর্তৃক হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ ক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে একাধারে তিন দিন একটি ঘটনা ঘটতে থাকলো। রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ এখন তোমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তির আগমন

হবে যে জান্নাতের অধিবাসী। আর প্রত্যেকবারই আনসারদের কোন একজন হতেন সেই আগন্তুক। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিল যে, তিনি এমন কি কাজ করেন যার ভিত্তিতে নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে বারবার এই সুসংবাদ দান করলেন। সুতরাং তার ইবাদাতের অবস্থা দেখার জন্য একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে তিনি পরপর তিন দিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাতের বেলা তিনি কোন প্রকার অস্বাভাবিক কাজ–কর্ম দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভাই, আপনি এমন কি কাজ করেন, যে কারণে আমরা নবীর (সা) মুখে আপনার সম্পর্কে এই বিরাট সুসংবাদ শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমার ইবাদাত–বন্দেগীর অবস্থা তো আপনি দেখেছেন। তবে একটি বিষয় হয়তো এর কারণ হতে পারে। আর তা হলো,

لَا أَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ غِلًّا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا أَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِيَّاهُ -

"আমি আমার মনের মধ্যে কোন মুসলমানের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং মহান আল্লাহ তাকে যে কল্যাণ দান করেছেন সে জন্য তাকে হিংসাও করি না।"

তবে এর মানে এ নয় যে, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের কথা ও কাজে যদি কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে তাকে তিনি ত্রুটি বলবেন না। কোন ঈমানদার ভুল করলেও সেটাকে ভুল না বলে শুদ্ধ বলতে হবে কিংবা তার ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত বলা যাবে না, ঈমানের দাবী কখনো তা নয়। কিন্তু কোন জিনিসকে প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল বলা এবং ভদ্রতা রক্ষা করে তা প্রকাশ করা এক কথা আর শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষ পোষণ করা, নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করা এবং গালমন্দ করা আরেক কথা। সমসাময়িক জীবিত লোকদের বেলায়ও এরূপ আচরণ করা হলে তা একটি বড় অন্যায়। কিন্তু পূর্বের মৃত লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা আরো বড় অন্যায়। কারণ, এরূপ মন ও মানসিকতা এমনই নোংরা যে, তা মৃতদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। এর চেয়েও বড় অন্যায় হলো, সেই সব মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি করা যারা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের হক আদায় করেছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পৃথিবীতে ইসলামের আলোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন যার বদৌলতে আজ আমরা ঈমানের নিয়ামত লাভ করেছি। তাদের মাঝে যেসব মতানৈক্য হয়েছে সে ক্ষেত্রে কেউ যদি এক পক্ষকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে এবং অপর পক্ষের ভূমিকা তার মতে সঠিক না হয় তাহলে সে এরূপ মত পোষণ করতে পারে এবং যুক্তির সীমার মধ্যে থেকে তা প্রকাশ করতে বা বলতেও পারে। কিন্তু এক পক্ষের সমর্থনে এতটা বাড়াবাড়ি করা যে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কথা ও লেখনীর মাধ্যমে গালি দিতে ও নিন্দাবাদ ছড়াতে থাকার এটা এমন একটা আচরণ যা কোন আল্লাহভীরু মানুষের দ্বারা হতে পারে না। কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থী এ আচরণ যারা করে তারা তাদের এ আচরণের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে যে, কুরআন মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমরা যাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করি তারা মু'মিন

নয়, বরং মুনাফিক। কিন্তু যে গোনাহর সপক্ষে সাফাই ও ওযর হিসেবে এ অপবাদ পেশ করা হয়ে থাকে তা ঐ গোনাহর চেয়েও জঘন্য। কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলোই তাদের এ অপবাদ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট। কারণ এ আয়াতগুলোর বর্ণনাধারার মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীকালের মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না রাখতে এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এসব আয়াতে পর পর তিন শ্রেণীর লোককে 'ফাই'-এর সম্পদ লাভের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম মুহাজির, দ্বিতীয় আনসার এবং তৃতীয় তাদের পরবর্তীকালের মুসলমান। তাদের পরবর্তী কালের মুসলমানদের বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্বে যেসব লোক ঈমান আনার ব্যাপারে অগ্রগামী তোমরা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। একথা সবারই জানা যে, অগ্র-পশ্চাত বিবেচনায় ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রগামী বলতে এখানে মুহাজির ও আনসার ছাড়া আর কেউ-ই হতে পারে না। তাছাড়া মুনাফিক কারা সে সম্পর্কে এই সূরা হাশরেরই ১১ থেকে ১৭ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুনাফিক তারাই যারা বনী নাযীর যুদ্ধের সময় ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে উৎসাহিত করেছিলো। আর মু'মিন তারা যারা এ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিল। যে মুসলমানের মনে এক বিন্দু আল্লাহভীতি আছে এরপরও কি সে ঐ সব ব্যক্তির ঈমানকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে, আল্লাহ নিজে যাদের ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন?

এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যারা সম্মানিত সাহাবীদের গালমন্দ ও নিন্দাবাদ করে 'ফাই' সম্পদে তাদের কোন অংশ নেই। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, গায়াতুল মুনতাহা) কিন্তু হানাফী ও শাফেয়ীগণ এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোককে ফাই-এর সম্পদ লাভের অধিকারী ঘোষণা করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব গুণের কোনটিকেই পূর্বশর্ত হিসেবে পেশ করেননি যে, সেই শ্রেণীর মধ্যে ঐ বিশেষ শর্তটি বর্তমান থাকলেই কেবল তাদেরকে অংশ দেয়া যাবে, অন্যথায় দেয়া যাবে না। মুহাজিরদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। তার অর্থ এ নয় যে, যে মুহাজিরের মধ্যে এই গুণটি নেই সে 'ফাই'-এর অংশ লাভের অধিকারী নয়। আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তারা মুহাজিরদের ভালবাসে। মুহাজিরদের যাই দেয়া হোক না কেন অভাবী হয়েও তারা সে জন্য মনের মধ্যে কোন চাহিদা অনুভব করে না।" এরও অর্থ এটা নয় যে, যেসব আনসার মুহাজিরদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না এবং মুহাজিরদের যা কিছু দেয়া হয় তারা তা পেতে আগ্রহী 'ফাই'-এর সম্পদে এমন মুহাজিরদের কোন অংশ নেই। অতএব তৃতীয় শ্রেণীর এই গুণটি অর্থাৎ তাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণকারীদের মাগফিরাতের জন্য তারা দোয়া করে, আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তাদের হৃদয়-মনে যেন কোন ঈমানদারদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না থাকে এটাও 'ফাই'-এর হকদার হওয়ার কোন পূর্বশর্ত নয়। বরং এটা একটা ভাল গুণের বর্ণনা এবং অন্য সব ঈমানদার ও পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে তাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি শিক্ষাদান।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

তোমরা[২২] কি সেই সব লোকদের দেখনি যারা মুনাফিকীর আচরণ গ্রহণ করেছে? তারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে ঃ যদি তোমাদের বহিষ্কার করা হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। তোমাদের ব্যাপারে কারো কথাই আমরা শুনবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা পাকা মিথ্যাবাদী। যদি তাদেরকে বহিষ্কার করা হয় তাহলে এরা তাদের সাথে কখনো বেরিয়ে যাবে না। আর যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করেও তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতপর কোনখান থেকে কোন সাহায্য তারা পাবে না।

২২. পুরো এই রুকূ'র আয়াতসমূহের বাচনভঙ্গি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় বনু নাযীরকে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ শুরু হতে এখনো কয়েকদিন দেরী ছিল সেই সময় এ রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযীরকে এই নোটিশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার অন্যান্য মুনাফিক নেতারা তাদের বলে পাঠালো যে, আমরা দুই হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করার জন্য আসবো। আর বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। অতএব তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও এবং কোন অবস্থায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো না। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আর তোমরা এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে আমরাও চলে যাব। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। তাই নাযিল হওয়ার পরম্পরার দিক দিয়ে এ রুকূ'টা প্রথমে নাযিল হয়েছে। আর বনী নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার পর প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তবে কুরআন মজীদে সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে প্রথম রুকূ'

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاۗءِ جُدُرٍ ۭ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۭ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾

তাদের মনে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী।[২৩] *কারণ, তারা এমন লোক যাদের কোন বিবেক–বুদ্ধি নেই।*[২৪] *এরা একত্রিত হয়ে (খোলা ময়দানে) কখনো তোমাদের মোকাবিলা করবে না। লড়াই করলেও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত জনপদে বা প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে করবে। তাদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কোন্দল অত্যন্ত কঠিন। তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে কর। কিন্তু তাদের মন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।*[২৫] *তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন। এরা তাদের কিছুকাল পূর্বের সেই সব লোকের মত যারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে।*[২৬] *তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।*

আগে এবং দ্বিতীয় রুকূ' পরে রাখার কারণ হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথম রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ তারা যে তোমাদের মোকাবেলায় প্রকাশ্যে ময়দানে নামছে না তার কারণ এ নয় যে, তারা মুসলমান, তাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে এবং এরূপ কোন আশংকাও তাদের মনে আছে যে, ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও তারা যদি ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। বরং তোমাদের প্রকাশ্য মোকাবেলা করা থেকে যে জিনিস তাদের বিরত রাখে তা হলো, ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তোমাদের ভালবাসা, প্রাণপণ সংকল্প এবং আত্মত্যাগের স্পৃহা আর তোমাদের পারস্পরিক দৃঢ় ঐক্য দেখে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে। তারা ভাল করেই জানে যে, তোমরা নগণ্য সংখ্যক হলেও শাহাদাতের যে অদম্য আকাংখা তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিকে জান কবুল মুজাহিদ বানিয়ে রেখেছে এবং যে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কারণে তোমরা একটি ইস্পাত কঠিন দল ও সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছো তার সাথে সংঘর্ষ বাধলে ইহুদীদের সাথে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, কারো অন্তরে আল্লাহর ভয়ের চেয়ে অন্য কারো ভয় অধিক থাকলে তা মূলত আল্লাহর ভয় না থাকারই নামান্তর। একথা সবারই জানা, যে ব্যক্তি দু'টি বিপদের একটিকে লঘু এবং অপরটিকে গুরুতর মনে করে সে

প্রথমোক্ত বিপদটির পরোয়াই করে না। দ্বিতীয় বিপদটি থেকে রক্ষা পাওয়াই তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

২৪. ছোট এই আয়াতাংশে একটি বড় সত্য তুলে ধরা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি জানে, মানুষের শক্তি নয়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শক্তিই ভয় করার মত। এ কারণে যেসব কাজে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহির ভয় থাকবে এ ধরনের সকল কাজ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। এ ক্ষেত্রে জবাব চাওয়ার মত কোন মানবীয় শক্তি থাক বা না থাক তা দেখার প্রয়োজন সে মনে করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর ন্যস্ত করেছেন তা সমাধা করার জন্য সে তৎপর হয়ে উঠবে। গোটা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও সে তার পরোয়া করবে না। কিন্তু একজন বুদ্ধি-বিবেকহীন মানুষের কাছে যেহেতু আল্লাহর শক্তি অনুভূত হয় না কিন্তু মানুষের শক্তিসমূহ অনুভূত হয় তাই সমস্ত ব্যাপারে সে তার কর্মনীতি নির্ধারণ করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের শক্তির প্রতি লক্ষ রেখে। কোন কিছু থেকে দূরে থাকলে এ জন্য থাকে না যে, সে জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে। বরং এ জন্য দূরে থাকে যে, সামনেই কোন মানবীয় শক্তি তার খবর নেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আর কোন কাজ যদি সে করে তবে তাও এ জন্য করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা সে জন্য সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশী। বরং এ জন্য করে যে, কোন মানবীয় শক্তি তা করতে নির্দেশ দিচ্ছে কিংবা পছন্দ করছে এবং সে-ই এ জন্য পুরস্কৃত করবে। বুঝা ও না বুঝার এই পার্থক্যই প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানদার ও ঈমানদারের জীবন ও কর্মকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয়।

২৫. এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রথম দুর্বলতা হলো, তারা ছিল ভীরু—আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে মানুষকে ভয় করতো। ঈমানদারদের মত তাদের সামনে এমন কোন উন্নত লক্ষ ও আদর্শ ছিল না যা অর্জনের জন্য তাদের মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হতো। তাদের দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো মুনাফিকীর আচরণ ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মজবুত ও সুসংবদ্ধ দলে পরিণত করতে পারতো। যে বিষয়টি তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাহলো, নিজেদের শহরে বহিরাগত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও শাসন চলতে দেখে তাদের কলিজা দগ্ধ হচ্ছিলো আর স্বদেশবাসী আনসার কর্তৃক মুহাজিরদের সসম্মানে গ্রহণ করতে দেখে তাদের মন দুখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিলো। এই হিংসার কারণে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং আশেপাশের ইসলাম বৈরীদের সাথে ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ করে এই বহিরাগত প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খতম করে দিতে চাইতো। তাদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই নেতিবাচক উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গঠনমূলক জিনিস ছিল না। তাদের প্রত্যেক নেতার আলাদা আলাদা দল ও উপদল ছিল। প্রত্যেকেই নিজের মাতবরী ফলাতে চাইতো। তারা কেউ কারো অকৃত্রিম বন্ধু ছিল না। প্রত্যেকের মনে অন্যদের জন্য এতটা হিংসা-বিদ্বেষ ছিল যে, নিজেদের সাধারণ শত্রুর মোকাবেলায়ও তারা নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা ভুলতে কিংবা একে অপরের মূলোৎপাটন থেকে বিরত থাকতে পারতো না।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে বনী নাযীর যুদ্ধের পূর্বেই মুনাফিকদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের দিক থেকে বাস্তব কোন

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَاۤ اَنَّهُمَا فِی النَّارِ خَالِدَیْنِ فِیْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ ﴿١٧﴾

এদের উদাহরণ হলো শয়তান। সে প্রথমে মানুষকে বলে কুফরী কর। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন সে বলে, আমি তোমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় পাই।[২৭] উভয়েরই পরিণাম হবে এই যে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হবে। জালেমদের প্রতিফল এটাই।

বিপদের আশংকা নেই। তাই বারবার এ খবর শুনে তোমাদের ঘাবড়ে যাওয়ার আদৌ কোন কারণ নেই যে, তোমরা বনী নাযীরকে অবরোধ করার জন্য যাত্রা করলেই এই মুনাফিক নেতা দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে এবং একই সংগে বনী কুরাইযা ও বনী গাতফান গোত্র দু'টিকেও তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে উস্কে দেবে। এসবই লম্ফঝম্ফ মাত্র। চরম পরীক্ষা শুরু হতেই এর অন্তসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

২৬. এখানে কুরাইশ গোত্রের কাফের এবং বনী কায়নুকার ইহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজ–সরঞ্জামের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এ সব দুর্বলতার কারণে মুসলমানদের সাজ–সরঞ্জামহীন মুষ্টিমেয় লোকের একটি দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

২৭. অর্থাৎ এসব মুনাফিক বনী নাযীরের সাথে সেই একই আচরণ করছে, যে আচরণ শয়তান মানুষের সাথে করে থাকে। এখন এসব মুনাফিক তাদের বলছে, তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও প্রয়োজনে আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো। কিন্তু তারা যখন সত্যি সত্যি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন এরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের পরিণতি কি হলো তা দেখার জন্য ফিরেও তাকাবে না। শয়তান প্রত্যেক কাফেরের সাথে এ ধরনের আচরণই করে থাকে। বদর যুদ্ধে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সাথেও সে এরূপ আচরণ করেছিল। সূরা আনফালের ৪৮ আয়াতে এর উল্লেখ আছে। প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে তাদেরকে হিম্মত ও সাহস যুগিয়ে বদর প্রান্তরে এনে হাজির করেছে এবং বলেছেঃ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ (আজ কেউই তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না। আর আমি তো তোমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী হিসেবে আছিই)। কিন্তু যখন দুটো সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়েছে তখন সে একথা বলতে বলতে পালিয়েছে ঃ

اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ ، اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۗ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

৩ রুকূ'

হে[২৮] ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।[২৯] আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।[৩০] তারাই ফাসেক। যারা দোযখে যাবে এবং যারা জান্নাতে যাবে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতে যাবে তারাই সফলকাম।

(আমি তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি তো আল্লাহকে ভয় পাই।)

২৮. কুরআন মজীদের নিয়ম হলো, যখনই মুনাফিক মুসলমানদের মুনাফিকসুলভ আচরণের সমালোচনা করা হয় তখনই তাদেরকে নসীহতও করা হয়। যাতে তাদের যার যার মধ্যে এখনো কিছুটা বিবেক অবশিষ্ট আছে সে যেন তার এই আচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে ধ্বংসের সেই গহবর থেকে উঠে আসার চিন্তা করে যার মধ্যে সে প্রকৃতির দাসত্বের কারণে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ রুকূ' পুরোটাই এ ধরনের নসীহতে পরিপূর্ণ।

২৯. আগামীকাল অর্থ আখেরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো আগামীকাল যার আগমন ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সেই ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড় নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মাণের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখেরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখেরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রিম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝٢٢

আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।[৩১] আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এ জন্য পেশ করি যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।

আল্লাহই সেই[৩২] মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।[৩৩] অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন।[৩৪] তিনিই রহমান ও রহীম।[৩৫]

পাবে না। এর সাথে দ্বিতীয় জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের হিসাব পরীক্ষক বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে ভাল এবং মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখেরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে, না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব–নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। অন্যথায় সে নিজের ভবিষ্যত নিজেই ধ্বংস করবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো নিজেকে ভুলে যাওয়া, সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে সে দুনিয়ায় তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে সে যখন একথা ভুলে যায় যে, সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় তখন আর সে শুধু সেই এদের বন্দেগী করে না। এমতাবস্থায় সে প্রকৃতই যার বান্দা তাকে বাদ দিয়ে যাদের সে বান্দা নয় এমন অনেকের বন্দেগী করতে থাকে। এটা আর একটা মারাত্মক ও সর্বাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান হলো সে বান্দা বা দাস, স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সে কেবল এক আল্লাহর বান্দা, তার ছাড়া আর কোরো বান্দা সে নয়। একথাটি যে ব্যক্তি জানে না প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজেকে জানে না। আর যে ব্যক্তি একথাটি জেনেও এক মুহূর্তের জন্যও তা ভুলে যায় সেই মুহূর্তে সে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা কোন আল্লাহদ্রোহী বা মুশরিক অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত মানুষই করতে পারে। সঠিক পথের ওপর মানুষের টিকে থাকা পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহকে স্মরণ করার ওপর। আল্লাহ

তা'আলা সম্পর্কে গাফেল হওয়া মাত্রই সে নিজের সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যায় আর এই গাফিলতিই তাকে ফাসেক বানিয়ে দেয়।

৩১. এই উপমার তাৎপর্য হলো, কুরআন যেভাবে আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর কাছে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে পাহাড়ের মত বিশাল সৃষ্টিও যদি তার উপলব্ধি লাভ করতে পারতো এবং কেমন পরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর সামনে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে তা যদি জানতো তাহলে সেও ভয়ে কেঁপে উঠতো। কিন্তু যে মানুষ কুরআনকে বুঝতে পারে এবং কুরআনের সাহায্যে সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, কিন্তু এরপরও তার মনে কোন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় না কিংবা যে কঠিন দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে তার আল্লাহকে কি জবাব দেবে সে বিষয়ে আদৌ কোন চিন্তা তার মনে জাগে না। বরং কুরআন পড়ার বা শোনার পরও সে এমন নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রীয় থাকে যেন একটি নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন পাথর। শোনা, দেখা ও উপলব্ধি করা আদৌ তার কাজ নয়। মানুষের এই চেতনাহীনতা ও নিরুদ্বিগ্নতা বিস্ময়কর বৈকি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ১২০)।

৩২. এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে, যিনি তোমার ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং যাঁর কাছে অবশেষে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে সেই আল্লাহ কেমন এবং তাঁর গুণাবলী কি? উপরোল্লেখিত বিষয়টি বর্ণনার পর পরই আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা আপনা থেকেই মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তার লেনদেন ও বুঝা পড়া কোন সাধারণ সত্তার সাথে নয়, বরং এমন এক জবরদস্ত সত্তার সাথে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এখানে এ বিষয়টি জেনে নেয়া দরকার যে, যদিও কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর গুণাবলী এমন অনুপম ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু দু'টি স্থান বিশেষভাবে এমন যেখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর একটি হলো, সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী (২৫৫ আয়াত) অপরটি হলো সূরা হাশরের এই আয়াতগুলো।

৩৩. অর্থাৎ যিনি ছাড়া আর কারোই ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থান এমন নয় যে, তার বন্দেগী ও আরাধনা করা যেতে পারে। যিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিকই নয় যে, সে উপাস্য হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে।

৩৪. অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা তাও তিনি জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোন বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যা অতীত হয়ে গিয়েছে, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তার সবকিছুই তিনি সরাসরি জানেন। এসব জানার জন্য তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন।

৩৫. অর্থাৎ একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যার রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যপ্ত এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। গোটা বিশ্ব-জাহানে আর একজনও এই সর্বাত্মক ও অফুরন্ত রহমতের অধিকারী নেই। আর যেসব সত্তার মধ্যে দয়ামায়ার এই গুণটি দেখা যায় তা আংশিক ও

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٢٣ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٤

আল্লাহ–ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি বাদশাহ,[৩৬] অতীব পবিত্র,[৩৭] পূর্ণাঙ্গ শান্তি,[৩৮] নিরাপত্তাদানকারী,[৩৯] হিফাযতকারী,[৪০] সবার ওপর বিজয়ী,[৪১] শক্তি বলে নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে সক্ষম।[৪২] এবং সবার চেয়ে বড় হয়েই বিরাজমান থাকতে সক্ষম।[৪৩] আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে।[৪৪] সেই পরম সত্তা তো আল্লাহ–ই যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দানকারী এবং সেই অনুপাতে রূপদানকারী।[৪৫] উত্তম নামসমূহ তাঁর–ই।[৪৬] আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে।[৪৭] তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[৪৮]

সীমিত। তাও আবার তার নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট নয়। বরং স্রষ্টা কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সামনে রেখে তা তাকে দান করেছেন তিনি কোন সৃষ্টির মধ্যে দয়ামায়ার আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকলে তা এ জন্য করেছেন যে, তিনি একটি সৃষ্টিকে দিয়ে আরেকটি সৃষ্টির প্রতিপালন ও সুখ–স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে চান। এটাও তাঁরই রহমতের প্রমাণ।

৩৬. মূল আয়াতে الملك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ প্রকৃত বাদশাহ তিনিই। তাছাড়া শুধু الملك শব্দ ব্যবহার করায় তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি কোন বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট কোন রাজ্যের বাদশাহ নন, বরং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি বস্তুর তিনিই মালিক। প্রতিটি বস্তু তার ইখতিয়ার, ক্ষমতা এবং হুকুমের অধীন। তার কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌম ক্ষমতাকে (Soverignty) সীমিত করার মত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীর এ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ – (الروم : ٢٦)

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত।" (আর রূম–২৬)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ – (السجده : ٥)

"আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব কাজের ব্যবস্থাপনা তিনিই পরিচালনা করে থাকেন।"

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ – (الحديد : ٥)

"আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। সব বিষয় আল্লাহর দিকেই রুজু করা হবে।"

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ– (الفرقان : ٢)

"বাদশাহী ও সার্বভৌমত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়।"

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ– (يس : ٨٢)

"সবকিছুর কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে।" (ইয়াসীন–৮২)

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ – (البروج : ١٦)

"যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম" (আল বুরুজ–১৬)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ – (الانبياء : ٢٣)

"তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে অন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হয়।"

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ – (الرعد : ٤١)

"আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই।"

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ – (المؤمنون : ٨٨)

"তিনিই আশ্রয় দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

(আল মু'মিনূন, ৮৮)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ – (ال عمران : ٢٦)

"বলো, হে আল্লাহ, বিশ্ব–জাহানের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করো আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমার আয়ত্বে। নিসন্দেহে তুমি সব বিষয়ে শক্তিমান।" (আলে ইমরান, ২৬)

এসব স্পষ্ট ঘোষণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বাদশাহী সার্বভৌমত্ব কোন সীমিত বা রূপক অর্থের বাদশাহী নয়, বরং সত্যিকার বাদশাহী যা

সার্বভৌমত্বের পূর্ণাংগ অর্থ ও পূর্ণাংগ ধারণার মূর্তপ্রতীক। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝায় তার অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও থাকলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার বাদশাহীতেই আছে। তাঁকে ছাড়া আর যেখানেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার দাবী করা হয় তা কোন বাদশাহ বা ডিক্টেটরের ব্যক্তি সত্তা, কিংবা কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী অথবা কোন বংশ বা জাতি যাই হোক না কেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেননা, যে ক্ষমতা অন্য কারো দান, যা এক সময় পাওয়া যায় এবং আবার এক সময় হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্য কোন শক্তির পক্ষ থেকে যা বিপদের আশংকা করে, যার প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকা সাময়িক এবং অন্য বহু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গণ্ডি সীমিত করে দেয় এমন সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আদৌ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না।

কিন্তু কুরআন মজীদ শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয় না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা গোটা বিশ্ব–জাহানের বাদশাহ। এর সাথে পরবর্তী আয়াতাংশগুলোতে স্পষ্ট করে বলছে, তিনি এমন বাদশাহ যিনি 'কুদ্দুস,' 'সালাম,' 'মু'মিন', 'মুহাইমিন', 'আযীয', 'জাব্বার', 'মুতাকাব্বির,' 'খালেক', 'বারী' এবং 'মুছাওবির'।

৩৭. মূল ইবারতে قدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قدس । قدس অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। قدوس অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা কোন পকার দোষ–ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোন মন্দ বৈশিষ্টের অনেক উর্ধ্বে। বরং তা এক অতি পবিত্র সত্তা যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। এখানে একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, চরম পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তরভুক্ত যে সত্তা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং বদনিয়াত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে অধিনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে এমন সত্তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক–বুদ্ধি ও স্বভাব–প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কারণে মানুষ যাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে পবিত্রতা না থাকলেও তা আছে বলে ধরে নেয়। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরংকুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন চূড়ান্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি পবিত্র নয় এবং তা হতেও পারে না। ব্যক্তিগত বাদশাহী, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, অন্য কোন পদ্ধতির মানবীয় সরকার যাই হোক না কেন কোন অবস্থায়ই তার সম্পর্কে চরম পবিত্রতার ধারণা করা যেতে পারে না।

৩৮. মূল আয়াতে السلام শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ শান্তি। কাউকে 'সুস্থ' ও 'নিরাপদ' না বলে 'নিরাপত্তা' বললে আপনা থেকেই তার মধ্যে আধিক্য অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কাউকে সুন্দর না বলে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে সে আপাদমস্তক সৌন্দর্যমণ্ডিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে السلام বলার অর্থ তার গোটা সত্তাই পুরাপুরি শান্তি । কোন বিপদ, কোন দুর্বলতা কিংবা অপূর্ণতা স্পর্শ করা অথবা তাঁর পূর্ণতায় কোন সময় ভাটা পড়া থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

৩৯. মূল আয়াতে المؤمن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির মূল ধাতু হলো امن । امن অর্থ ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়া। তিনিই মু'মিন যিনি অন্যকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন তাই তাঁকে মু'মিন বলা হয়েছে। তিনি কোন সময় তাঁর সৃষ্টির ওপর জুলুম করবেন, কিংবা তার অধিকার নস্যাত করবেন কিংবা তার পুরস্কার নষ্ট করবেন অথবা তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন এ ভয় থেকে তার সৃষ্টি পুরোপুরি নিরাপদ। আর কর্তার কোন কর্ম অর্থাৎ তিনি কাকে নিরাপত্তা দেবেন তা যেহেতু উল্লেখিত হয়নি বরং শুধু المؤمن বা নিরাপত্তা দানকারী বলা হয়েছে তাই আপনা থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব–জাহান ও তার সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর নিরাপত্তা।

৪০. মূল আয়াতে اَلْمُهَيْمِنُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়। এক, তত্ত্বাবধান ও হিফাজতকারী। দুই, পর্যবেক্ষণকারী, কে কি করছে তা যিনি দেখছেন। তিন, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানেও যেহেতু শুধু المهيمن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কর্তার কোন কর্ম নির্দেশ করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি কার তত্ত্বাবধানকারী ও সংরক্ষক, কার পর্যবেক্ষক এবং কার দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা বলা হয়নি। তাই শব্দের এ ধরনের প্রয়োগ থেকে স্বতঃই যা অর্থ দাঁড়ায় তা হলো তিনি সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করছেন, সবার কাজকর্ম দেখছেন এবং বিশ্ব–জাহানের সমস্ত সৃষ্টির দেখাশোনা, লালন–পালন এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৪১. মূল ইবারতে العزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যার মোকাবিলায় অন্য কেউ মাথা তুলতে পারে না, যার সিদ্ধান্তসমূহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই এবং যার মোকাবিলায় সবাই অসহায় ও শক্তিহীন।

৪২. মূল আয়াতে الجبار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শব্দমূল বা ধাতু হলো جبر । جبر শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঠিক করা, কোন জিনিসকে শক্তি দ্বারা সংশোধন করা। যদিও আরবী ভাষায় جبر শব্দটির কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু সংশোধন অর্থে এবং কোন কোন সময় শুধু জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, সংস্কার ও সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে جبار (জাব্বার) বলার অর্থ হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, যদিও তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও جبار শব্দটির মধ্যে বড়ত্ব ও মহত্ববোধক অর্থও বিদ্যমান। খেজুরের যে গাছ অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে তার ফল সংগ্রহ করা কারো জন্য সহজসাধ্য নয় আরবী ভাষায় তাকে জাব্বার বলে। অনুরূপ যে কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও জাকজমকপূর্ণ তাকে জাব্বার বা অতি বড় কাজ বলা হয়।

৪৩. মূল আয়াতে اَلْمُتَكَبِّرُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, যে প্রকৃতপক্ষে বড় নয়, কিন্তু খামাখা বড়ত্ব জাহির করে। দুই, যে প্রকৃতপক্ষেই বড় এবং বড় হয়েই থাকে। মানুষ হোক, শয়তান হোক বা অন্য কোন মাখলুক হোক, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার কোন বড়ত্ব মহত্ব নেই, তাই নিজেকে নিজে বড় মনে করা এবং

অন্যদের কাছে নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব জাহির করা একটা মিথ্যা দাবী ও জঘন্য দোষ। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতই বড়, বড়ত্ব বাস্তবে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট এবং বিশ্ব–জাহানের সব বস্তু তাঁর সামনে ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাই তাঁর বড় হওয়া এবং বড় হয়ে থাকা নিছক কোন দাবী বা ভান নয়। বরং একটি বাস্তবতা। এটি কোন খারাপ বা মন্দ বৈশিষ্ট নয়, বরং একটি গুণ ও সৌন্দর্য যা তাঁর ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।

৪৪. অর্থাৎ যারাই তাঁর ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও গুণাবলীতে কিংবা তাঁর সত্তায় অন্য কোন সৃষ্টিকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা অতিবড় এক মিথ্যা বলছে। কোন অর্থেই কেউ আল্লাহ তা'আলার শরীক বা অংশীদার নয়। তিনি তা থেকে পবিত্র।

৪৫. অর্থাৎ সারা দুনিয়ার এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত পুরাপুরি তাঁরই তৈরী ও লালিতপালিত। কোন কিছুই আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি অথবা তার নির্মাণ ও পরিপাটি করণে অন্য কারো সামান্যতম অবদানও নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্মকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় বা স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়টি হলো সৃষ্টি অর্থাৎ পরিকল্পনা করা। এর উদাহরণ হলো, কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন ইমারত নির্মাণের পূর্বে যেমন মনে মনে স্থির করে যে, অমুক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে এরূপ ও এরূপ একটি ইমারত নির্মাণ করতে হবে। সে তখন মনে মনে তার নমুনা বা ডিজাইন (Design) চিন্তা করতে থকে। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ইমারতের বিস্তারিত ও সামগ্রিক কাঠামো কি হবে এ পর্যায়ে সে তা ঠিক করে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো برء । এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো পৃথক করা, চিরে ফেলা, ফেড়ে আলাদা করা। স্রষ্টার জন্য 'বারী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাঠামোকে বাস্তবে রূপ দেন। অর্থাৎ যে নকশা তিনি নিজে চিন্তা করে রেখেছেন তাকে কল্পনা বা অস্তিত্বহীনতার জগত থেকে এনে অস্তিত্ব দান করেন। এর উদাহরণ হলো, ইঞ্জিনিয়ার ইমারতের যে কাঠামো ও আকৃতি তাঁর চিন্তার জগতে অংকন করেছিলেন সে অনুযায়ী ঠিকমত মাপজোঁক করে মাটিতে দাগ টানেন, ভিত খনন করেন, প্রাচীর গেঁথে তোলেন এবং নির্মাণের সকল বাস্তব স্তর অতিক্রম করেন। তৃতীয় পর্যায় হলো, 'তাসবীর'–এর অর্থ রূপদান করা। এখানে এর অর্থ হলো, কোন বস্তুকে চূড়ান্ত, পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ও রূপ দান করা। এই তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার কাজ ও মানুষের কাজের মধ্যে আদৌ কোন মিল বা তুলনা হয় না। মানুষের কোন পরিকল্পনাই এমন নয় যা পূর্বের কোন নমুনা থেকে গৃহীত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি পরিকল্পনা অনুপম এবং তাঁর নিজের আবিষ্কার। মানুষ যা তৈরী করে তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপাদানসমূহের একটিকে আরেকটির সাথে জুড়ে করে। অস্তিত্ব নেই এমন কোন জিনিসকে সে অস্তিত্ব দান করে না, বরং যা আছে তাকেই বিভিন্ন পন্থায় জোড়া দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যে উপাদান দিয়ে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে উপাদানও তাঁর নিজের সৃষ্টি। অনুরূপ আকার–আকৃতি দানের ব্যাপারেও মানুষ আবিষ্কর্তা নয়, বরং আল্লাহর তৈরী আকার–আকৃতি ও চিত্রসমূহের অনুকরণকারী ও অপরিপক্ক নকলকারী। প্রকৃত আকার–আকৃতি দানকারী ও চিত্র অংকনকারী মহান আল্লাহ। তিনি প্রতিটি জাতি,

প্রজাতি এবং প্রতিটি ব্যক্তির অনুপম ও নজীরহীন আকার–আকৃতি বানিয়েছেন এবং কোন সময় একই আকার–আকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাননি।

৪৬. নামসমূহ অর্থ গুণবাচক নাম। তাঁর উত্তম নাম থাকার অর্থ হলো, যেমন গুণবাচক নাম দ্বারা তার কোন প্রকার অপূর্ণতা প্রকাশ পায় যেসব গুণবাচক নাম তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। যেসব নাম তাঁর পূর্ণাংগ গুণ ও বৈশিষ্ট প্রকাশ করে সেই সব নামে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ আ'আলার এসব উত্তম নামের উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে তাঁর পবিত্র সত্তার ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজা এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতিসহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হয় তাহলে সে জন্য কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে।

৪৭. অর্থাৎ মুখের ভাষায় ও অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা সর্বপ্রকার দোষ–ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল–ভ্রান্তি থেকে পবিত্র।

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা হাদীদের ২নং টীকা।